Jagannath University

Journal of Arts

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস

Faculty of Arts | কলা অনুষদ

Volume 14, Number 1

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

Jagannath University

Jagannath University Journal of Arts

Volume 14, Number 1, January-June 2024

ISSN 2519-5816

Jagannath University

Jagannath University Journal of Arts

Volume 14, Number 1, January-June 2024

Published in : October, 2024

All views and ideas expressed in articles published in the journal solely belong to the author(s). The Editor, the Editorial Board and the Publisher have no responsibility or liability in such cases.

Published by : Dean, Faculty of Arts
Jagannath University
Dhaka-1100, Bangladesh

Cover Design : Rasel Rana

Printed at : DS Printing and Packaging
234/D New Elephant Road, Dhaka-1205
Cell : 01817078796

Subscription : BDT 300/- (Three Hundred Taka)

ISSN : 2519-5816

Chief Editor

Hosne Ara Begum

Faculty of Arts
Jagannath University, Dhaka-1100
www.jnu.ac.bd

Advisory Board

Professor Dr. Sharif Uddin Ahmed
Retd. Professor
Department of History
University of Dhaka, Dhaka

Professor Dr. Syed Manzoorul Islam
Retd. Professor
Department of English
University of Dhaka, Dhaka

Professor Dr. Syed Azizul Haque
Retd. Professor
Department of Bangla
University of Dhaka, Dhaka

Professor Dr. M. Matiur Rahman
Retd. Professor
Department of Philosophy
University of Dhaka, Dhaka

Professor Nisar Hossain
Department of Drawing & Painting
Faculty of Fine Arts
University of Dhaka, Dhaka

Professor Dr. Lutfor Rahman
Department of Drama & Dramatics
Jahangirnagar University, Savar, Dhaka

Professor Dr. Farida Akter Khanam
Department of Sociology
Jagannath University, Dhaka

Professor Dr. Muhammad Shafiq Ahmad
Department of Islamic Studies
University of Dhaka, Dhaka

Professor Dr. Nusrat Fatema
Department of Islamic History and Culture
University of Dhaka, Dhaka

Professor Dr. Shamima Sultana
Department of Bangla
Jahangirnagar University, Savar, Dhaka

Editorial Board

Chief Editor	:	**Professor Dr. Hosne Ara Begum** Dean Faculty of Arts, Jagannath University, Dhaka
Associate Editor	:	**Professor Dr. Protiva Rani Karmaker** Institute of Modern Languages Jagannath University, Dhaka
		Professor Dr. A. K. M Mahbubul Haq Department of Bangla Jagannath University, Dhaka
Members	:	**Professor Md. Aloptogin** Dean Faculty of Fine Arts, Jagannath University, Dhaka
		Professor Dr. Milton Biswas Chairman Department of Bangla, Jagannath University, Dhaka
		Professor Dr. Md. Momin Uddin Chairman Department of English, Jagannath University, Dhaka
		Professor Dr. Murshida Bintey Rahman Chairman Department of Hisroty, Jagannath University, Dhaka
		Professor Dr. Md. Atiar Rahman Chairman Department of Islamic History and Culture Jagannath University, Dhaka
		Professor Dr. Muhammad Abdul Wadud Chairman Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka
		Professor Dr. Mohammad Hafizul Islam Chairman Department of Philosophy, Jagannath University, Dhaka
		Dr. Jhumur Ahmed Chairman Department of Music, Jagannath University, Dhaka
		Katharin Purification Chairman Department of Theatre, Jagannath University, Dhaka
Editorial Assistant	:	**S. M. Enamul Haque** Assistant Registrar Faculty of Arts, Jagannath University, Dhaka

সম্পাদকীয়

জগন্নাথ ইউনির্ভাসিটি জার্নাল অব আর্টস খণ্ড-১৪ সংখ্যা-১ প্রকাশ করা হলো। এ সংখ্যায় ১২টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধগুলোর বিন্যাস ও সূচিতে লেখকের নামের আদ্যাক্ষরের বর্ণানুক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। 'জার্নাল অব আর্টস'-এর উপদেষ্টামণ্ডলী, সম্পাদনা-পর্ষদের সদস্য ও সহযোগী সম্পাদকবৃন্দকে ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই জার্নালের সম্মানিত প্রাবন্ধিকগণকে, যারা তাদের মূল্যবান গবেষণা-প্রবন্ধ প্রেরণ করে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যারা বিচক্ষণতার সাথে প্রবন্ধগুলো মূল্যায়ন করে তাদের মূল্যবান অভিমত দিয়েছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা। কলা অনুষদভুক্ত কর্মকর্তা, কর্মচারী যারা এই জার্নাল প্রকাশনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

এ বছরের জুলাই-আগস্ট মাসে দেশব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জার্নাল প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম
প্রধান সম্পাদক
জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস

সূচি

		পৃষ্ঠা
১.	**নজরুলের রবীন্দ্রসংগীত প্রীতি** আশিক সরকার	১
২.	**আবদুল গফুর হালীর গানে লোকদর্শন** নাদিরা ইসলাম	১৮
৩.	**রবীন্দ্রসংগীতের বাণীতে মৃত্যুচিন্তার প্রতিফলন** নুসরাত জাহান প্রভা	৩৩
৪.	**সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সংকট : ইসলামের সমাধান** ড. মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন	৪৭
৫.	**রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ : মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে সাহিত্যে সমাজভাবনার স্বরূপ** রোকাইয়া আক্তার	৬৩
৬.	**Autonomous English language learning during covid-19: Learners' perceptions, involvement, and challenges** Md. Abdur Rouf, Md. Abdus Salam	৭৫
৭.	**Poetic Crafts and Emotions : Bangabandhu in Shamsur Rahman's Poems** Dr. Md. Abu Zafor	৯৪
৮.	**Saga of the Subaltern- Religion and Politics in *Manush Hobar Kalponik Golpo*** Debasish Biswas	১০৩
৯.	**/r/ in Bangladeshi Accent : Rhotic or Non-rhotic? A Case Study** Jakir	১১৩
১০.	**Exploring the Impact of Bangladeshi Dialects on Linguistic, Facial, and Behavioral Characteristics in Bangladesh** Protiva Rani Karmaker	১১৯
১১.	**Gender Identity in *Herland* and *Sultana's Dream*: A Comparative Study of Feminine Utopia** Shah Md Ariful Abed	১৩৩
১২.	**Fanning Feminism : Fanon's 'necessary violence' in Nawal El Saadawi's *Woman at Point Zero*** Sharmin Afroz Shantu	১৩৯

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৪, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২৪

নজরুলের রবীন্দ্রসংগীত প্রীতি

আশিক সরকার*

Abstract

Rabindranath Tagore (1861-1941) and Kazi Nazrul Islam (1899-1976) are the two legendary talents of Bengali and Indian Music. The relationship between these two almost contemporary musicians was characterized by a forerunner-follower dynamic, marked by mutual respect and affection. Rabindranath and Rabindra Sangeet occupies a special place in Nazrul's life. Nazrul's acquaintance and intimacy with Rabindra literature and music started from his school life. Later, returning from 49th Bengali Regiment, Nazrul started his music career as a Rabindra Sangeet singer along with his literary activities. During those days, besides singing Rabindranath's songs in various musical programmes, he also taught Rabindra Sangeet very eagerly. Not only singing and teaching Rabindra Sangeet, Rabindranath's songs fascinated him so much that he quoted different lines of Rabindra Sangeet in many of his stories, novels and essays. Even in the lyrics and tunes of several songs composed by him, Rabindra influence is noticeable. The purpose of this essay is to explore the influence of Rabindra Sangeet on the overall life and works of Nazrul. To the best of my knowledge, there has been no specific, systematic, theoretical, comprehensive studies and informative research on this regards. In this article, I have attempted to present the results of the research on this very important topic in the content analysis method and descriptive method.

চাবিশব্দ: রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসংগীত, গায়ক নজরুল, নজরুলের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ, বাণীর প্রভাব, সুরের প্রভাব

ভূমিকা

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠতা জন্মায় তাঁর স্কুল-জীবনে। জানা যায়, ত্রিশালে দরিরামপুর হাইস্কুলে অধ্যয়নকালে অনুষ্ঠিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে নজরুল রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' ও 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতা দুটি আবৃত্তি করেন এবং উপস্থিত সকলে তাঁর আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হন।[১] তবে স্কুল-জীবনে তাঁর রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া বা চর্চার গ্রহণযোগ্য কোনও তথ্য এখনও পাওয়া যায় না। সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে জনৈক শিক্ষকের বিদায়-সংবর্ধনায় নজরুল কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গানটি গাওয়ার যে তথ্য পাওয়া যায়, তা সঠিক নয়। কেননা, রবীন্দ্রনাথ উক্ত গানটি রচনা করেছিলেন ২৬শে ভাদ্র ১৩৩২ সনে (১৯২৫ খ্রি:) আর নজরুল নবম শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন ১৯১৬ সনে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উক্ত গানটি কবি শিখেছিলেন ১৯২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে। ১১ই আগস্ট ১৯২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর থেকে বেগম

* সহকারী অধ্যাপক, সঙ্গীত বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

শামসুন্নাহার মাহমুদকে এক পত্রে কবি লেখেন : 'চিঠি লিখছি আর গাচ্ছি একটা নতুন শেখা গানের দুটো চরণ : হে ক্ষণিকের অতিথি এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া।'[২]

করাচিতে ৪৯নং বেঙ্গল রেজিমেন্টে অবস্থানকালে নজরুল যে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা করতেন, তার উল্লেখ রয়েছে কবির সে সময়ের সহযোদ্ধা শম্ভু রায়ের বক্তব্যে। শম্ভু রায়ের ভাষ্য অনুযায়ী, নজরুল সে সময়ে রীতিমতো রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি সংগ্রহ করে গান তুলতেন।[৩] এরপর ১৯২০ সালের মার্চ মাসে করাচি থেকে ফেরার সময় নজরুল সযত্নে সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁর অতি প্রিয় রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপিগুলো। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জানান:

> "...তার গাঁটরি-বোচকাগুলি খুলে দেখলাম। তাতে তার লেপ, তোশক ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল। ... কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ইত্যাদিও ছিল"।[৪]

কলকাতায় ফিরে নজরুল সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক হিসেবেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন :

> নজরুলের জনপ্রিয়তার অন্য একটি কারণ ছিল তার গান। ... সে মূলত গাইত রবীন্দ্রনাথের গান। এত বেশি রবীন্দ্রসঙ্গীত সে কি করে মুখস্থ করেছিল তা ভেবে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। সমস্ত 'কুরআন' যাঁরা মুখস্থ করেন তাঁদের হাফিজ বলা হয়, আমরা বলতাম নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রসঙ্গীতের হাফিজ।[৫]

রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার সূত্রেই সে-যুগে কলকাতা শহরে রবীন্দ্রগানের গায়কী অনুসরণ করে এবং স্বরলিপি মেনে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন তাঁদের অন্যতম হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই সময় তাঁরা একসঙ্গে অনেক আসরেই রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেছেন। এর কিছুকাল পর থেকে কবি স্বয়ং সংগীত রচনা শুরু করলেও কোনও আসরে স্বরচিত গান গাইতেন না, রবীন্দ্রসংগীতই ছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) এক বিয়ের আসরে নজরুলের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'নজরুলের সঙ্গে দুটি সন্ধ্যে' শীর্ষক স্মৃতিতর্পণে :

> প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় ঢালা ফরাসে গানের আসর বসে গেল তক্ষুনি। যেখানে নজরুল সেখানেই গান, সেখানেই প্রাণ, সেখানেই অফুরান। কোত্থেকে একটা হার্মোনিয়ম এসে জুটল, গান ধরল নজরুল। কিন্তু আশ্চর্য, নিজের গান না গেয়ে ধরল রবীন্দ্রসঙ্গীত। 'তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে/দেবে কি গো বাসা আমায়-দেবে কি-একটি ধারে।' গান শেষ হতেই ফেলুদা, উমাপদ ভট্টাচার্য, টেনে নিল হার্মোনিয়ম। সে ধরল: 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে/এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।' নজরুল যদি ধরে, 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে', ফেলুদা ধরে, 'গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে'।[৬]

১৯২১ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে নজরুল ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮৫-১৯৬৯) সঙ্গে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন যান। ট্রেনে যেতে যেতে শহীদুল্লাহ সাহেবকে তিনি রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলির* সবগুলো গান একের পর এক গেয়ে শোনান। সেদিন শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের দোতলায় সান্ধ্য-আসরে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে এ-কথা জানান। শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে কবিগুরু বলেন, "তাই নাকি? অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি তো! আমার গীতাঞ্জলির গান সব তো

আমারই মনে থাকে না"।[৭] কবির ঘনিষ্ঠজনদের স্মৃতিচারণ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নানা সময়ে কবি যেসব গান গেয়েছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ :

১. আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি
২. বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে
৩. ও চাঁপা ও করবী
৪. হে ক্ষণিকের অতিথি
৫. কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া
৬. এতদিন যে বসেছিলেম
৭. তোমার সুরের ধারা ঝরে
৮. তোরা পারবি নাকি যোগ দিতে
৯. যদি বারণ করো তবে গাহিব না
১০. দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
১১. সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা
১২. আমার সকল দুখের প্রদীপ
১৩. ঝরঝর বরিষে বারিধারা
১৪. আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই ... ইত্যাদি

নানা আসরে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের পাশাপাশি কবি তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের রবীন্দ্রনাথের গান শেখাতেনও। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একবার কবিবন্ধু কাজী মোতাহার হোসেনকে (১৮৯৭-১৯৮১) 'কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া, এসেছি ভুলে' এবং 'পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে' রবীন্দ্রসংগীত দুটি শিখিয়েছিলেন তিনি। 'নানারঙের দিনগুলি' শীর্ষক স্মৃতিচারণে যোবায়দা মির্যা জানান :

> এমন আত্মবিস্মৃত রবীন্দ্রভক্ত খুব কমই দেখা যায়। কবি কাকা [কাজী নজরুল ইসলাম] একদিন পর্যায়ক্রমে চারজনকে গান শেখাতে গেলেন। শফিকুন্নেছাকে 'হে ক্ষণিকের অতিথি', নোটনকে [উমা মৈত্র] 'আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি', রানু সোমকে [প্রতিভা বসু : ১৯১৫-২০০৬] 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে' এবং চতুর্থ জনের নাম ঠিকানা মনে নেই। তবে গানটা হচ্ছে 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে পানিয়া ভরণে চল লো গোরী'। অর্থাৎ হত্যা করা দূরের কথা, তাঁর অস্তিত্বের তিন ভাগই রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরতে বাঁচিয়ে রাখতে সর্বদা সচেষ্ট।[৮]

বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিচারণ থেকে আমরা নজরুল কর্তৃক রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া ও শেখানো সম্পর্কিত নানা তথ্য জানতে পারি। কিন্তু কীভাবে তিনি এই বিপুল সংখ্যক রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা করেছিলেন, সে-সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু জানা যায় না। গত শতাব্দীর বিশের দশকের শুরুর দিকে যখন নজরুল নানা আসরে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে যাচ্ছেন, তখন রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তা বা প্রচার বর্তমান সময়ের মত এতটা অধিক ছিল না। সে যুগে ইচ্ছে করলে সহজেই কেউ অনেকগুলো রবীন্দ্রসংগীত গায়কী ঠিক রেখে অবিকৃত সুরে শিখে ফেলবেন – এমনটা ছিল প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় নজরুলের ভান্ডারে এত অধিক পরিমাণে রবীন্দ্রসংগীত থাকা রীতিমতো

বিস্ময়কর। প্রকৃতপক্ষে এ-সময় তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি সংগ্রহ করে গভীর অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে সেই স্বরলিপি দেখে গান তুলতেন এবং নানা আসরে পরিবেশন করতেন। তাছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের কোনও শিক্ষকের কাছে তাঁর তালিম নেয়ার গ্রহণযোগ্য তথ্য-প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। তবে জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে গবেষক মানস বসু জানান, গ্রামোফোন কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ অনাদিকুমার দস্তিদারের বিশেষ বন্ধুত্ব হয় এবং সেই সূত্রে তাঁর কাছে বেশ কিছু রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন কবি।[৯]

শুধু রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া এবং শেখানোই নয়, রবীন্দ্রনাথের গান তাঁকে এতোটাই আবিষ্ট করেছিল যে, তাঁর লেখা বহু গল্প-উপন্যাসে প্রাসঙ্গিকভাবে রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেছেন নজরুল। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' তাঁর রচিত প্রথম প্রকাশিত রচনা। এটি ১৯১৯ সালের মে-জুন মাসে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত *সওগাত* পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের দুটি গান ব্যবহৃত হয়েছে। গান দুটি হলো : ১. শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে এবং ২. সখী প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায়। গল্পে প্রথম গানের প্রথম ছত্রের অর্ধাংশ 'শ্রাবণের ধারার মত' এবং দ্বিতীয় গানটির আভোগ বা শেষ দুই পঙ্‌ক্তি 'সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে/কেন, কি বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে' উদ্ধৃত করেছেন নজরুল।[১০] নিচে নজরুল রচিত নানা গল্প-উপন্যাসে ব্যবহৃত রবীন্দ্রসংগীতের একটি তালিকা সন্নিবেশিত হলো :

ক্র.	নজরুলের রচনা	ব্যবহৃত রবীন্দ্রসংগীত
১.	বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী (গল্প) প্রকাশ : *সওগাত* (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬)	ক. শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে খ. সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায়
২.	ব্যথার দান (গল্প) প্রকাশ : *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা* (মাঘ, ১৩২৬)	ক. তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা খ. আমার পরাণ যাহা চায় গ. আমার সকল দুখের প্রদীপ
৩.	মেহের-নেগার (গল্প) প্রকাশ : *নূর* (মাঘ, ১৩২৬)	ক. কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা
৪.	ঘুমের ঘোরে (গল্প) প্রকাশ : *নূর*, (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৬)	ক. ওহে সুন্দর মরি মরি খ. আমার সকল দুখের প্রদীপ গ. অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে ঘ. কেন রে তোর দুয়ারটুকু পার হতে সংশয় ঙ. ওগো দেখি আঁখি তুলে চাও
৫.	হেনা (গল্প) প্রকাশ : *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা* (কার্তিক, ১৩২৬)	ক. বিদায় করেছ যারে নয়নজলে
৬.	রিক্তের বেদন (গল্প) প্রকাশ : *নূর* (বৈশাখ, ১৩২৭)	ক. দুজনে দেখা হলো মধু যামিনীরে খ. ওগো কাঙাল আমায় কাঙাল করেছ গ. আমাকে যে বাঁধবে ধরে

ক্র.	নজরুলের রচনা	ব্যবহৃত রবীন্দ্রসংগীত
		ঘ. প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
৭.	অতৃপ্ত কামনা (গল্প) প্রকাশ : *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা* (শ্রাবণ, ১৩২৭)	ক. আমি বহু বাসনায় প্রাণপনে চাই খ. ঝরঝর বরিষে বারিধারা
৮.	বাদল বরিষণে (গল্প) প্রকাশ : *মোসলেম ভারত* (শ্রাবণ, ১৩২৭)	ক. ঝরঝর বরিষে বারিধারা খ. এমন দিনে তারে বলা যায় গ. এস হে সজল ঘন বাদল বরিষণে ঘ. আমার নয়ন ভুলানো এলে
৯.	দুরন্ত পথিক (গল্প) প্রকাশ : *দৈনিক নবযুগ* ; পরবর্তীতে *মোসলেম ভারত* (আশ্বিন, ১৩২৭)	ক. দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
১০.	সাঁঝের তারা (গল্প) প্রকাশ : *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা* (মাঘ, ১৩২৭)	ক. অশ্রুনদীর সুদূর পাড়ে খ. বেলা গেলো তোমার পথ চেয়ে
১১.	রাজবন্দীর চিঠি (গল্প) প্রকাশ : গল্প-গ্রন্থ *ব্যথার দান* (১৯২১)	ক. তুমি জান ওগো অন্তর্যামী খ. প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে গ. সন্ধ্যা হলো গো-ও মা, সন্ধ্যা হলো, বুকে ধর
১২.	শিউলি-মালা (গল্প) প্রকাশ : *সওগাত* (শ্রাবণ, ১৩৩৭)	ক. আমার গোধূলিলগন এলো বুঝি কাছে গোধূলি লগন রে
১৩.	বাঁধনহারা (পত্রোপন্যাস) *মোসলেম ভারত* (বৈশাখ, ১৩২৭ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)	ক. হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে খ. মনে রয়ে গেলো মনের কথা গ. আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে ঘ. সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে
১৪.	কুহেলিকা (উপন্যাস) *নওরোজ* (আষাঢ়, ১৩৩৪ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)	ক. নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে

শের-ই বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)-এর অর্থানুকূল্যে ১২ই জুলাই ১৯২০ তারিখে আত্মপ্রকাশ করে সান্ধ্য-দৈনিক *নবযুগ*। যুগ্মভাবে এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বভার ন্যস্ত হয় নজরুল এবং মুজফ্ফর আহ্মদের কাঁধে। এর মধ্য দিয়ে পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে নজরুলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ-সময় বিভিন্ন সংবাদের শিরোনাম হিসেবে প্রায়ই তিনি রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করতেন। যেমন : রবীন্দ্রনাথের 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার / পরানসখা বন্ধু হে আমার' গানটি অবলম্বনে ইরাকের রাজা ফয়সল-এর আগমন-সংবাদের শিরোনাম লেখেন 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার / পরাণ সখা ফয়সুল হে আমার'। অথবা, 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া / দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া' শীর্ষক গানের অনুসরণে

সংবাদ শিরোনাম করেন 'কালাতে ধলাতে লেগেছে এবার / মন্দ মধুর হাওয়া / দেখি নাই কভু দেখি নাই ওগো / এমন ডিনার খাওয়া'।

তেমনি আবার সান্ধ্য-দৈনিক *নবযুগ* ও অর্ধ-সাপ্তাহিক *ধুমকেতু* পত্রিকার সম্পাদকীয়তেও নানাভাবে রবীন্দ্রগানের বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেছেন নজরুল। কোথাও কোথাও আবার প্রাসঙ্গিকভাবে গানে পঙ্‌ক্তির ঈষৎ পরিবর্তনও করেছেন। যেমন : *নবযুগ*-র জন্য লেখা 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে রবীন্দ্রনাথের 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটির এমনি রূপান্তর ঘটিয়েছেন নজরুল :

> আমার ভাইয়ের খুন মাখানো সমাধির উপর দাঁড়াইয়া আমরা এক ভাই অন্য ভাইকে চিনিয়াছি। আর বড় প্রাণ ভরিয়াই গাহিয়াছি-
>
> 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে,
> এমন ঘরের হয়ে পরের মতন
> ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।[১১]

একই পত্রিকায় প্রকাশিত 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' শিরোনামের সম্পাদকীয় শুরু হয়েছে রবীন্দ্রসংগীতের উদ্ধৃতি দিয়ে :

> হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান
> অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।[১২]

'একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে' শীর্ষক রবীন্দ্রসংগীতের প্যারডি রচনা করে 'লাট-প্রেমিক আলী ইমাম' শিরোনামে *নবযুগ* পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন এভাবে :

> সার আলী ইমামকে শুধু জিজ্ঞাসা করি, আমাদের গায়ের দাগগুলো কি এমন করিয়া মাখন ডলিলেই এত শীঘ্র মিলাইয়া যাইবে ? –
>
> 'সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলেনি,
> তারই যে স্রোতে আঁকাবাঁকা চোখা বাণী,
> এখনো গুঁতোর রেখা আছে লেখা পিঠের কূলে।-
> আজই কি সব ফাঁকি, সে-কথা কি গেছ ভুলে?'[১৩]

২৬শে শ্রাবণ ১৩২৯ (১২ই আগস্ট ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে অর্ধ-সাপ্তাহিক *ধুমকেতু*। এই পত্রিকা প্রকাশের সময় আশীর্বাণী প্রদান করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই পত্রিকার ৮ই ভাদ্র ১৩২৯ সংখ্যায় 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে কবি লেখেন :

> এস ভাই, পথের সাথী বন্ধুরা আমার, এস আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দল! আজ শনি এসেছে তোমাদের পোড়া-কপালে বাসি ছাই-এর পাণ্ডুর টিকা পরিয়ে দিতে। এস আমার লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারা ভাইরা! আজ ঝর-ঝর বারিধারার সুরে সুরে কান্না উঠেছে – 'হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতিহারা!'[১৪]

এখানে কবিগুরুর 'ঝর ঝর বরিষে বারিধারা' গানটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করা হযেছে ঈষৎ পরিবর্তন করে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মূল পাঠ হবে : 'হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা'। একই পত্রিকার পরবর্তী অর্থাৎ ১২ই ভাদ্র, ১৩২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'তুবড়ী বাঁশির ডাক' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির সূচনায় কবি রবীন্দ্রসংগীতের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন এভাবে :

ঐ শোনো–
পুব সাগরের পার হতে কোন এলো পরবাসী।
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন
হাওয়ায় হাওয়ায় শন্‌শন্
সাপ খেলাবার বাঁশি।[১৫]

পুরো প্রবন্ধ জুড়ে উক্ত রবীন্দ্রসংগীতটির নানা শব্দবন্ধের অনুরণন ধ্বনিত হয়েছে। 'পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় ধুমকেতু পত্রিকার ৫ই আশ্বিন ১৩২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে' এবং 'জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর' শীর্ষক দুটি গানের মধ্যস্থিত একাধিক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃতিস্বরূপ ব্যবহার করেছেন কবি। ১৩২৯ সালের ২৬শে শ্রাবণ 'ধুমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ধুমকেতুর পথ' সম্পাদকীয় শুরু হয়েছে এভাবে:

আমার এই যাত্রা হলো শুরু
ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।

'মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে' 'জয় প্রলয়ঙ্কর' বলে 'ধুমকেতু'কে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। আমার কর্ণধার আমি। আমায় পথ দেখাবে আমার সত্য।[১৬]

আলোচ্য প্রবন্ধে কবি তিনটি রবীন্দ্রসংগীতের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। যথা : ১. 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু, এখন, ও গো কর্ণধার', ২. 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব' এবং ৩. 'জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর'। ১লা ভাদ্র ১৩২৯ সংখ্যায় 'রুদ্র-মঙ্গল' শিরোনামে মুদ্রিত সম্পাদকীয়তে পুনরায় 'জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর!' গানটির অনুরণন দেখতে পাই, পাই 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে / সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে' গানটির প্রচ্ছন্ন আভাস :

সকল অহঙ্কার তাদের চোখের জলে ডুবাও। নামিয়ে নিয়ে এস ঝুঁটি ধরে ঐ অর্থ-পিশাচ যক্ষগুলোকে। তোমাদের পিতৃ-পুরুষের রক্ত-মাংস-অস্থি দিয়ে ঐ যক্ষের দেউল গড়া, তোমাদের গৃহলক্ষ্মীর চোখের জল আর দুধের ছেলের হৃৎপিণ্ড নিঙড়ে তাদের ঐ লাবণ্য, ঐ কান্তি। তোমাদের অভিশাপ-তিক্ত মারি-বিষ-জ্বালা লাগিয়ে তাদের সে-কান্তি, সে-লাবণ্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাও! বল নির্জিত ভাইরা আমার, বল উৎপীড়িত বোনেরা আমার, বল বেদনাতুর অভাব-ক্লিষ্ট নর-নারী-

'জয় ভৈরব জয় শঙ্কর
জয় জয় প্রলয়ঙ্কর
শঙ্কর! শঙ্কর!

মারো তোমার ত্রিশূল ছুঁড়ে, দুলাও তোমার সর্বনাশের ঝাণ্ডা, কে আছ ভৈরব-পন্থী নর-নারী, আর হাঁকো-হাঁকো,–

'জয় ভৈরব জয় শঙ্কর
জয় জয় প্রলয়ঙ্কর
শঙ্কর! শঙ্কর!'[১৭]

১৯৩৮ সালে রবীন্দ্র-কাহিনী অবলম্বনে 'দেবদত্ত ফিল্মস্'-এর প্রযোজনায় এবং নরেশ মিত্রের পরিচালনায় নির্মিত হয় 'গোরা' চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক ছিলেন নজরুল। সংগীত পরিচালক হওয়ার সূত্রে প্রথমবারের মতো এই চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রগানের সংগীত পরিচালনা করেন তিনি। চলচ্চিত্রটি কলকাতার 'চিত্রা' প্রেক্ষাগৃহে ৩০শে জুলাই মুক্তিলাভ করে। দেবদত্ত ফিল্মস্ প্রচারিত সিনেমার বুলেটিন অনুযায়ী রবীন্দ্রসংগীত ছিল ৫টি। এগুলো হলো : ১. যে রাতে মোর দুয়ারগুলি, ২. মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন, ৩. সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে, ৪. ওহে সুন্দর, মম গৃহে এবং ৫. রোদন-ভরা এ বসন্ত। কিন্তু মূল চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয় ৭টি গান, তার মধ্যে ৩টি রবীন্দ্রসংগীত, একটি নজরুল রচিত ও সুরারোপিত গান, দু'টি সংস্কৃত শ্লোক এবং একটি বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত গান। রবীন্দ্রনাথের গান তিনটি হচ্ছে- (ক) 'সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায়' (আংশিক), (খ) 'ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি' এবং (গ) 'রোদন-ভরা এ বসন্ত'।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাওয়ার ৩/৪ দিন পূর্বে প্রেস-রিলিজ দেখে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ গানগুলোতে সুরের ত্রুটি নির্দেশ করে চলচ্চিত্রের মুক্তিতে বাধা দেয়। এমতাবস্থায় নজরুল চলচ্চিত্র-পরিচালকসহ চলচ্চিত্রের একটি কপি এবং ছোট একটি প্রজেকশন মেশিন নিয়ে সরাসরি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হন এবং তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। সব শুনে রবীন্দ্রনাথ বেশ বিরক্ত হয়ে বলেন, "কি কাণ্ড বলতো ? তুমি শিখিয়েছো আমার গান আর ওরা কোন আক্কেলে তার দোষ ধরে ? তোমার চেয়েও আমার গান কী তারা বেশি বুঝবে। আমার গানের মর্যাদা কী ওরা বেশি দিতে পারবে?"[১৮] এরপর ছবি না দেখেই তিনি অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করে দেন।

এইভাবে নজরুল তাঁর জীবদ্দশায় বারংবার রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন, শিখিয়েছেন এবং তাঁর নানা সাহিত্যকর্মে প্রয়োগ করেছেন, এমনকি পত্রিকার সম্পাদকীয়তেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। নানাভাবে রবীন্দ্রসংগীতকে যিনি জীবনের সাথে জড়িয়ে নিয়েছিলেন ভালোবেসে কিংবা প্রয়োজনে, তাঁর সৃষ্ট গানে রবীন্দ্রসংগীতের সুরের প্রভাব থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই নজরুল সুরারোপিত বেশ কিছু গানে আমরা রবীন্দ্রসংগীতের প্রভাব দেখতে পাই। এ-প্রসঙ্গে ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর লিখেছেন : 'প্রায় ৭০টি নজরুলগীতি এই রকম রবীন্দ্রসংগীতের গায়কীর প্রভাবে গঠিত। এখানে গায়কী অর্থে শুধু মাত্র স্বর বিন্যাস নয়, মীড়, স্বরক্ষেপণ সমস্তই বোঝায়।'[১৯] তবে এ-পর্যন্ত আমরা সরাসরি রবীন্দ্রনাথের গানের সুর প্রভাবিত নজরুলের সাতটি গানের সন্ধান পাই। নিচে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. 'এলো ঐ বনান্তে পাগল বসন্ত' গানটি পরজ-বসন্ত রাগে সুরারোপিত এবং ত্রিতালে নিবদ্ধ। এই গানটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের বিখ্যাত গান 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে' এর ছায়া

পরিলক্ষিত। গান দুটির মধ্যে সুরের তেমন পার্থক্য নেই; পার্থক্য কেবল এইটুকু যে, রবীন্দ্রনাথের মূল গানে শুধু শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহৃত হয়েছে আর নজরুলের গানে শুদ্ধ ও কড়ি উভয় মধ্যমই ব্যবহৃত। এ প্রসঙ্গে উভয় গানেরই প্রথম পঙ্‌ক্তির স্বরলিপি উদ্ধৃত হলো :

মূল গান

র্সা না র্সা -া **ও৩** { পা ণদা -া দা | পা মা পা দা | না -া র্সা -া | (র্সা না র্সা -া) }ও -া -া -া -া ও[২০]
ও রে ভা ই ফা গু ন্ লে গে ছে ব নে ব ০ নে ০ ও রে ভা ই ০ ০ ০ ০

ভাঙাগান

র্সা না ঋর্সা -া **ও৩** পা পদা -া দা | পা হ্মা পা দা | না -র্সা র্সা -া }| -া -া -া -া ও[২১]
এ লো ঐ ০ ব না ন্ তে পা গ ল ব স ন্ ত ০ ০ ০ ০ ০

নজরুলের এই গানটি এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘বাসন্তিকা’ রেকর্ড নাট্যের গান হিসেবে এন. ৭৩৩২ নম্বর রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। রেকর্ডটিতে গানটি গেয়েছেন মিস্ হরিমতি। ২৭ এপ্রিল ১৯৪০ তারিখে কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে বাসন্তীকুঞ্জ সংগীতানুষ্ঠানে গানটি সম্প্রচার করা হয়। গানটি *গানের মালা* (১৯৩৪) গীতিগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

২. ‘এলো এলো রে বৈশাখী ঝড়’ গানটি মিশ্র ইমন রাগে সুরারোপিত এবং কাহারবা তালে নিবদ্ধ। নজরুল রচিত এ গানটিতে রবীন্দ্রনাথের ‘এসো এসো হে তৃষ্ণার জল’ গানটির ছায়া লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, কবিগুরু গানটি শান্তিনিকেতনে নলকূপ খনন উপলক্ষে ১৯২২ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে রচনা করেন। পরে গানটি *গীতবিতান* এ প্রকৃতি পর্যায়ের গ্রীষ্ম উপপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমাদের আলোচ্য গানটিও গ্রীষ্মের একটি অপূর্ব আবাহন গীতি। অর্থাৎ, ভাবগত দিক থেকে উভয় গানের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুরের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের মূল গানটির কাঠামো নিয়ে এই গানটি রচিত হলেও অল্প কিছু ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে ১৯৩৪ সালের মে মাসে রেকর্ডবদ্ধ হয় গানটি। শিল্পী পারুল সেনের গাওয়া এ গানটির রেকর্ড নং এন. ৭২২৮। গানটি *গানের মালা* (১৯৩৪) গীতিগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩, ‘যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম’ গানটি সিন্ধু-কাফি রাগে এবং যৎ তালে নিবদ্ধ। উক্ত গানটিতে রবীন্দ্রনাথের ‘যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার’ গানটির সুরের ছায়া লক্ষিত হয়। তবে আলোচ্য গান দুটির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। গীতশৈলীর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ রচিত মূলগানটি ঝাঁপতালে নিবদ্ধ একটি খেয়াল অঙ্গের গান হলেও নজরুলের আলোচ্য গানটি একটি বিশুদ্ধ রীতির টপ্পা। নজরুল রচিত আলোচ্য গানটির রেকর্ড এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। সে যুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতগুণী সংগীতাচার্য জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী গানটি রেকর্ডে গেয়েছেন; রেকর্ড নম্বর: এন. ৭২৩৪। পরে গানটি *গানের মালা* (১৯৩৪) গীতিগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪. 'আজি চৈতি হাওয়ার মাতন লাগে' গানটির মূল গান রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রকৃতি পর্যায়ের বসন্ত উপপর্যায়ের 'আজ খেলা ভাঙার খেলা' শীর্ষক গান। নজরুল রচিত আলোচ্য গানটি এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিল্পী হরিমতী দেবীর কণ্ঠে গীত হয়ে এন. ৭৩৩২ নম্বর রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। গান দুটির সুরের কাঠামো প্রায় একই রকম হলেও ছন্দের পার্থক্য লক্ষণীয়। মূলগানটি কাহারবা তালে নিবদ্ধ হলেও কবি তাঁর গানে দ্রুত লয়ের দাদরা তাল ব্যবহার করেছেন। নিচে গান দুটির প্রথম পঙ্ক্তির স্বরলিপি উদ্ধৃত হলোঃ

মূল গান

পা -ধা **ওও{** র্ণর্রা র্রর্সা -া ণা | ণধা -পা গা -মা **ও(** পা -া -া -া | -া -ধা ধপা -ধা)}ও[২২]

আ জ্ খে০ লা০ ০ ভা ঙা র্ খে ০ লা ০ ০ ০ ০ ০ আ জ্

ভাঙা গান

পা ধা **ওও{** ণা -র্রা র্রর্সা | -া ণা -া **ও** ধণা -ধপা -া | মগা -রা গা **ও**

আ জি চৈ ০ তী ০ হা ও য়া০ ০০ র্ মা০ ০ তন্

ও গমা -া -মপা | মপা -া -া **ও** -া -া -া | -া (পা ধা) }ও[২৩]

লা ০ ০ গে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ জি

৫. 'তৃষিত আকাশ কাঁপে রে' গানটি বৃন্দাবনী সারং রাগে সুরারোপিত এবং কার্ফা তালে নিবদ্ধ। এই গানটিতে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'দারুণ অগ্নি বাণে রে' গানটির সুরের প্রভাব লক্ষ করা যায়। *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় কার্তিক ১৩৪২ সংখ্যায় স্বরলিপিসহ গানটি প্রকাশিত হয়; স্বরলিপিকারঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিল্পী পারুল সেনের কণ্ঠে গানটি রেকর্ডবদ্ধ (রেকর্ড নম্বরঃ এন. ৭৪৮০) হয়। *গানের মালা* (১৯৩৪) গীতিগ্রন্থে গানটি সংকলিত হয়েছে।

৬. 'মালঞ্চে আজ কাহার যাওয়া আসা' গানটি খাম্বাজ রাগে সুরারোপিত এবং দাদরা তালে নিবদ্ধ। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত *গীতিশতদল গ্রন্থে* গানটি স্থান পায়। একই বছরের মার্চ মাসে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে শিল্পী মৃণালকান্তি ঘোষ কর্তৃক গীত হয়ে এন. ৭২১০ নম্বর রেকর্ডে প্রকাশিত হয় গানটি। আলোচ্য গানের সুরারোপে কবি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের হেমন্ত উপপর্যায়ের 'হেমন্তে কোন বসন্তেরই বাণী' গান থেকে।

৭. 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয়' গানটি রবীন্দ্রনাথ রচিত ছায়ানট রাগে সুরারোপিত এবং একতালে নিবদ্ধ বিখ্যাত 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়' গানটির সুরানুসরণে রচিত। উল্লেখ্য যে, সংগীতাচার্য প্রফেসর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর অনুরোধে কবি গানটি রচনা করেন। এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে শিল্পী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী গীত

গানটির রেকর্ড (রেকর্ড নম্বর: এন. ৭২৬৪) ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। গানটির রচনার প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে করুণাময় গোস্বামী জানিয়েছেন:

> স্বনামধন্য গায়ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী রবীন্দ্রনাথের 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়/কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়' গানটি রেকর্ডে গাইতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর গায়নভঙ্গীতে গানের রাবীন্দ্রিক মেজাজ না এসে প্রবল রাগসাংগীতিক মেজাজ এসে যাচ্ছিল বলে তিনি সে গান রেকর্ড করার অনুমতি পাননি। জ্ঞান গোস্বামী সে ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং ওই সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি গান লিখে দিতে বলেন নজরুলকে। নজরুল তখন 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়' গানটি রচনা করেন। জ্ঞান গোস্বামী খেয়ালোপম ভঙ্গিতে গেয়ে গানটিকে অসাধারণ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।[২৪]

আলোচ্য গানটিতে মূল গানের সুরকাঠামো প্রায় হুবহু অনুসৃত হলেও গায়কীর জন্য সামান্য ছোট-খাটো কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ উভয় গানেরই প্রথম পঙ্‌ক্তির স্বরলিপি উপস্থাপিত হলো:

মূল গান

ওও	ধা	-া	ণা	|	ধা	ধা	ণধা	|	পা	পক্ষা	$^{\text{ধ}}$পা	|	-া	রা	-গা	ও
	অ	ল্	প		ল	ই	য়া০		থা	কি০	তা		ই	মো	র্	
ও	মা	পা	$^{\text{পা}}$ধা	|	-মা	মা	গা	|	রা	-া	-গরা	|	-সন্	-সা	-া	ও[২৫]
	যা	হা	যা		য়	তা	হা		যা	০	০০		০০	০	য়	

ভাঙা গান

ওও {	ধা	-া	$^{\text{র্স}}$ণা	|	$^{\text{ধ}}$পা	পা	পা	|	পা	$^{\text{প}}$ক্ষা	ধপা	|	$^{\text{ক্ষ}}$-পরা	রা	-া	ও
	শূ	ন্	ন্য		এ	বু	কে		পা	খি	মো০		০র্	আ	য়	
ও	রা	গা	$^{\text{গ}}$রা	|	-াঃ	-গঃ	মপা	|	$^{\text{প}}$মা	-া	$^{\text{ম}}$-গা	|	$^{\text{মগ}}$-া	$^{\text{গ}}$-রা	-সা	} ও[২৬]
	ফি	রে	আ		০	য়	ফিরে		আ	০	০		০	০	য়	

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ রচিত আরও চারটি গানের প্যারডি রচনা করেন নজরুল। গানগুলো হলো : ১. 'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে', ২. 'তুমি নামো হে নামো শ্যামো হে শ্যামো', ৩. 'একদা তুমি আগা দৌড় কে ভাগা' এবং ৪. 'দেশ দেশ গণ্ডিত করি মন্দ্রিত তব ভেরি'। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

১. 'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে' গানটি রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে তুমি ধন্য ধন্য হে' গানটির সুরে রচিত ও ব্যঙ্গাত্মক ভাবে রঞ্জিত। ১৯২৩ সালে হুগলি জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় কবি উক্ত জেলের সুপার আর্সটনের অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ গানটি রচনা করেন। *ভাঙার গান* (১৯২৪) গ্রন্থে আলোচ্য গানটি 'সুপার বন্দনা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। গানটির পাদটীকায় কবি লিখেছিলেন :

> হুগলি জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল প্রকার জুলুম আমাদের উপর দিয়ে পরখ করে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় জেলের মূর্তিমান জুলুম বড়কর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে আমরা অভিনন্দন জানাতাম।[২৭]

২. 'তুমি নামো হে নামো শ্যামো হে শ্যামো' গানটির উৎস রবীন্দ্রনাথের 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো' গানটি। মূল গানের সঙ্গে আলোচ্য গানটির একটি পার্থক্য হল এই যে, ভক্তিভাবের মূল গানটিতে যেখানে মধ্যলয়ের দাদ্‌রা তাল ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে নজরুল তাঁর রচিত হাস্যরসাত্মক গানটিতে দ্রুত চালের দাদ্‌রা তাল ব্যবহার করে গানটির মেজাজই পরিবর্তন করে দেন। তাছাড়া গানটি আরো নাটকীয় ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে শুরুতে কিছু লৌকিক সংলাপের অপূর্ব সংযোজনে:

> কেডারে ? কেডা ? উ কেলিকদম্ব গাছে এই ডাল ওই ডাল কইরা লাফ দিয়া বেড়াইত্যাছ? ও-ঘোষ পাড়ার হেই বখাইট্টা পোলাটা না? উ-হুঁ-হু। আবার পিরুক পিরুক কইরা বাঁশি বাজান হইত্যাছে? নাম্যা আসো। ভরদুপুর বেলা মাইয়াগো সান ঘাটের কাছে অ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ আবার কেষ্ট সাজছেন? বলি কেষ্ট সাজছো? নামো শিগ্‌গিরি নামো পোড়া কপাইল্যা নামো।[২৮]

নজরুল রচিত এই কৌতুকাশ্রয়ী গানটি ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে এন. ১৭১৯৪ নম্বর রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। গানটি রেকর্ডে বাণীবদ্ধ করেন রঞ্জিত রায়। প্রথমে এই 'কমিক' গানটির নামকরণ করা হয়েছিল 'ঢাকাই কেষ্ট' (গ্রামোফোন কোম্পানি চুক্তিপত্র দ্রষ্টব্য) এবং পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'কলির কেষ্ট' (গ্রামোফোন বুলেটিন দ্রষ্টব্য)। কারণ, প্রকৃতই গানটির ভাব তার পৌরাণিক গণ্ডি ছেড়ে অবলীলায় কলিকালে অন্তর্প্রবিষ্ট হয়।

৩. 'একদা তুমি আগা দৌড় কে ভাগা' গানটি রবীন্দ্রনাথের 'একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরু মূলে' গান অনুসরণে রচিত। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাস-বিলম্বিত এই গভীর গানখানিও নজরুলের লঘু সুরারোপে একটি অসাধারণ 'কমিক' গানে রূপান্তরিত হয়। ১৩৪১ সালে ছোটদের মধুচক্র পত্রিকায় গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গানটির শিরোনাম 'আগা মুর্গী লে কে ভাগা'।

৪. 'দেশ দেশ গণ্ডিত করি মন্দ্রিত তব ভেরি' হাস্যরসাত্মক এই প্যারোডি গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ পর্যায়ের 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরি' শীর্ষক গানের সুর অনুসরণে রচিত। গানটি সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

উল্লিখিত এই গানগুলো ব্যতিরেকে রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নজরুল বিষ্ণুপুর ঘরানার কয়েকটি ধ্রুপদের বন্দিশ ভেঙে গান রচনা করেন। নিচে সংক্ষেপে গানগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. 'সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ' গানটি বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবাদপ্রতীম সংগীতসাধক যদুভট্ট (রঙ্গনাথ) রচিত তিলক-কামোদ রাগে ও ঝাঁপতালে নিবদ্ধ বন্দিশ 'কৌন রূপ বনে হো রাজাধিরাজ' অনুসরণে রচিত। এই একই বন্দিশ অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৬ সালে (ভাদ্র ১৩০৩) রচনা করেন 'মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ' গানটি। নজরুল রচিত আলোচ্য গানটি এইচএমভি গ্রামোফোন

কোম্পানি থেকে ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী রেকর্ড করেন (রেকর্ড নম্বর: এন.৭৩৪৫)। যদুভট্ট রচিত মূল ধ্রুপদটিতে স্থায়ীর পরে তিনটি অন্তরা আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানটি স্থায়ী ও অন্তরা এই দুই তুকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু নজরুল রচিত আলোচ্য গানটি চার তুক্ যুক্ত। মূল গানের স্থায়ী ও অন্তরার সুরকাঠামো আলোচ্য গানে অনুসৃত হয়েছে। আর সঞ্চারীর সুর নজরুল স্বয়ং করেছেন।

২. 'জয় নারায়ণ অনন্ত রূপধারী' গানটি তুলসী দাস রচিত নিশাসাগ রাগে এবং ঝাঁপতালের 'দুসহ দোখ দুখ দলনী' শীর্ষক ধ্রুপদ-বন্দিশের সুর অনুসরণে রচিত। উল্লেখ্য যে, উক্ত ধ্রুপদ বন্দিশটি অনুসরণে ১৮৯৭ সালে (ভাদ্র ১৩০৪) রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'পূজা' পর্যায়ের তাঁর বিখ্যাত গান 'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা'। মূল গানের সুরকাঠামো নজরুল রচিত আলোচ্য গানটির সুরারোপে প্রায় সর্বাংশেই গৃহীত হয়েছে। তবে মূল ধ্রুপদ গান এবং রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানের স্থায়ী এক পঙ্‌ক্তির হলেও নজরুল রচিত আলোচ্য গানটির স্থায়ী দুই পঙ্‌ক্তির; দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির সুর যোজনা নজরুলের স্বকীয় সৃষ্টি। নজরুল রচিত আলোচ্য গানটির প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয় এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। রেকর্ডে গানটি গেয়েছিলেন ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়। রেকর্ড নম্বর: এন. ১৭২২৮।

৩. 'মুরলী ধ্বনি শুনি ব্রজনারী' গানটি জানকী দাস রচিত 'মুরলী ধুনি শুনি অরি মাই' শীর্ষক ধ্রুপদ বন্দিশের সুর ভেঙে নজরুল রচনা করেন। উল্লেখ্য, উক্ত বন্দিশ অনুসরণেই রবীন্দ্রনাথ পূজা পর্যায়ের 'চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ' রচনা করেছিলেন। সিন্ধু-ঝাঁপতালে রচিত আলোচ্য গানটি ইন্দুরানী সেনগুপ্তের কণ্ঠে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে রেকর্ডধৃত হয়। কিন্তু পরে রেকর্ডটি বাতিল হয়। ৫, ১২, ১৯৩৯ তারিখে কলকাতা আকাশবাণী বেতারকেন্দ্রে প্রচারিত 'হরপ্রিয়া' সংগীতালেখ্যে শিল্পী শৈল দেবীর কণ্ঠে গানটি গীত হয়। মূল ধ্রুপদ বন্দিশের অসাধারণ বাংলা অনুবাদ আলোচ্য গানটি।

উদ্ধৃত এই গানগুলো ছাড়াও নজরুল রচিত ও সুরারোপিত বেশকিছু গানে রবীন্দ্রসংগীতের আংশিক প্রভাব পড়েছে। ব্রহ্মমোহন ঠাকুর তাঁর *নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা* এবং *নানা নজরুলের মালা* গ্রন্থে 'রবীন্দ্রসংগীতের সুরে প্রভাবিত' নজরুলের যে সব গানের উল্লেখ করেছেন নিচে তার একটি তালিকা দেওয়া হলো :

১. অনেক কথা বলা মাঝে (নজরুলকৃত সুর)
২. গানের সাথী আছে আমার
৩. হার মানি ননদিনী
৪. আমি দ্বার খুলে আর
৫. আমার গানের মালা
৬. উঠেছে কি চাঁদ সাঁঝ গগনে
৭. আজি চৈতি হাওয়ার মাতন
৮. মদির স্বপনে মম বন ভবনে

৯. স্নিগ্ধ-শ্যাম-বেণী-বর্ণা
১০. কোন্ দূরে ওকে যায় চলে যায়
১১. অগ্নিঋষি অগ্নিবীণা তোমার শুধু
১২. আঁখি তোল, আঁখি তোল কদম কেশর
১৩. অয়ি চঞ্চল লীলায়িত দেহা
১৪. তুমি কেন এলে পথে
১৫. বন মল্লিকা ফুটিবে যখন
১৬. মেঘ মেদুর গগণ কাঁদে
১৭. পথিক বন্ধু এসো এসো

শুধু সুর নয়, রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী, শব্দবন্ধ ও ভাবের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ফলে তাঁর রচিত বেশ কিছু গানে রবীন্দ্রসংগীতের ভাব-সাদৃশ্য দৃশ্যমান হয়। ১৯১৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ রচিত পূজা পর্যায়ের 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে' গানটি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নজরুল তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন *অগ্নি-বীণা*। নিচে নজরুল রচিত রবীন্দ্র-প্রভাবিত কিছু গানের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো :

১. রবীন্দ্রসংগীত
কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া, এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে নয়ন তুলে।[২৯]

নজরুল-সংগীত
তোমার কুসুম বনে আমি আসিয়াছি ভুলে।
তবু মুখপানে প্রিয় চাহ মুখ তুলে।।[৩০]

২. রবীন্দ্রসংগীত
ও আমার দেশের মাটি, তোমার প'রে ঠেকাই মাথা।[৩১]

নজরুল-সংগীত
জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।[৩২]

৩. রবীন্দ্রসংগীত
কার যেন এই মনের বেদন চৈত্রমাসের উতল হাওয়ায়,
ঝুমকোলতার চিকন পাতা কাঁপে রে কার চম্‌কে-চাওয়ায়।।[৩৩]

নজরুল-সংগীত
ঝুমকো-লতার চিকন পাতায়
হেরেছি তোমার লাবনি প্রিয়া।[৩৪]

৪. রবীন্দ্রসংগীত

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সেকি সহজ গান!
সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান।।[৩৫]

নজরুল-সংগীত

বজ্রে তোমার বাজ্‌ল বাঁশি,
বহ্নি হল কান্না-হাসি,
সুরের ব্যথায় প্রাণ উদাসী– মন সরে না কাজে।
[অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে][৩৬]

৫. রবীন্দ্রসংগীত

দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায় সারা বেলা গেল খেলে।।[৩৭]

নজরুল-সংগীত

পথ-ভোলা কোন্ রাখাল ছেলে।
সে একলা বাটে শূন্য মাঠে
খেলে বেড়ায় বাঁশি ফেলে'।।[৩৮]

৬. রবীন্দ্রসংগীত

ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথ ভুলে।।[৩৯]

নজরুল-সংগীত

আজি অলি ব্যাকুল ওই বকুলের ফুলে[৪০]

৭. রবীন্দ্রসংগীত

দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় ক'রে ধরিব হে।।[৪১]

নজরুল-সংগীত

তুমি দুখের বেশে এলে ব'লে ভয় করি কি হরি।
দাও ব্যথা যতই তোমায় ততই নিবিড় ক'রে ধরি।[৪২]

৮. রবীন্দ্রসংগীত

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে![৪৩]

নজরুল-সংগীত

অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে[৪৪]

এমনি বিভিন্নভাবে রবীন্দ্রসংগীতকে যিনি তাঁর জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, তাঁর সৃষ্ট সংগীতে রবীন্দ্র-প্রভাব খুব কমই দৃশ্যমান হয়। তাঁর রচিত তিন সহস্রাধিক সংগীতের মধ্যে খুব কম গানেই আমরা রবীন্দ্রগানের প্রভাব লক্ষ করি। কাজী নজরুল ইসলাম সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-বলয়ের ভেতরে থেকেও এর বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র এক ধারা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা নজরুল-সংগীত নামে সর্বত্র নন্দিত। এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা, তাঁর অনন্যতা।

তথ্যনির্দেশ

১. রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি* (কলকাতা : কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৭), পৃ. ১৪

২. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী, নবম খণ্ড*, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য-সম্পা. (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৯), পৃ. ২০০

৩. প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, *কাজী নজরুল* (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৬), পৃ. ৩৪

৪. মুজফ্‌ফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা* (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৫), পৃ. ১৭

৫. তদেব, পৃ. ২৮

৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'নজরুলের সঙ্গে দুটি সন্ধ্যে', কথাসাহিত্য সম্পাদকমণ্ডলী-সম্পা., *নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ* (কলকাতা : অমর সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ৩১

৭. নিশিকান্ত, 'আমার কৈশোর-স্মৃতিতে নজরুল', কথাসাহিত্য সম্পাদকমণ্ডলী-সম্পা., *নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ* (কলকাতা : অমর সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ৭০

৮. যোবায়দা মির্যা, 'নানারঙের দিনগুলি', রফিকুল ইসলাম-সম্পা., *আজকের সভ্যতা*, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬, নজরুল জন্ম-শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা (ঢাকা : সভ্যতা, ১৯৯৯), পৃ. ৬০

৯. মানস বসু, 'নজরুল মননে রবীন্দ্রসঙ্গীত', *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ২৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৯, পৃ. ৬৮

১০. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড*, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য-সম্পা. (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৭), পৃ. ২৫৩

১১. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড*, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য-সম্পা. (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৬), পৃ. ৩৮১

১২. তদেব, পৃ. ৩৯৯

১৩. তদেব, পৃ. ৪১৭

১৪. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৩

১৫. তদেব।

১৬. তদেব, পৃ. ৪২০

১৭. তদেব।

১৮. নিতাই ঘটক, 'চলচ্চিত্রে নজরুল : স্মৃতির আলোয়', *নজরুল একাডেমী পত্রিকা*, নবপর্যায়, প্রথম সংখ্যা, হেমন্ত ১৩৯৩, পৃ. ১০৭

১৯. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর., *নানা নজরুলের মালা*, (কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরি, ২০০৮), পৃ. ১২৮

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ফাল্গুনী, স্বরবিতান-৭* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৬), পৃ. ১৭

২১. সুধীন দাশ, *নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি*, ত্রয়োদশ খণ্ড, (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৭), পৃ. ৯

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বসন্ত*, *স্বরবিতান*-৬ (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৬), পৃ. ৯০-৯১
২৩. সুধীন দাশ, *নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি*, চতুর্দশ খণ্ড (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৬), পৃ. ২৯-৩২
২৪. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুলগীতি প্রসঙ্গ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬), পৃ. ৩৪৬
২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান*, *চতুর্থ খণ্ড* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৫), পৃ. ১৯
২৬. আসাদুল হক, *নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি*, চতুর্থ খণ্ড (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৫), পৃ. ১১৬-১১৭
২৭. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, *প্রথম খণ্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩
২৮. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, রশিদুন্ নবী-সম্পা. (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১৮), পৃ. ২৫৩
২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৯৪), পৃ. ৩৪৫
৩০. *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭
৩১. *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪
৩২. *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৮
৩৩. *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৩
৩৪. *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০
৩৫. *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮
৩৬. *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬
৩৭. *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮১
৩৮. *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৩
৩৯. *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০
৪০. *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
৪১. *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১
৪২. *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৭
৪৩. *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
৪৪. *নজরুল সংগীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৪, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২৪

আবদুল গফুর হালীর গানে লোকদর্শন

নাদিরা ইসলাম *

Abstract

Abdul Gafur Hali is one of the folk saints of Bangladesh. He composed about 2500 folk songs. During his lifetime, his songs 'Sona bandhu tui amare karli dibana', 'Moner bagane futilo phul go', 'Rasik tel kajla oi lal kuttaoala', 'Dekhe gare maijbhandare haitache noorer khela', 'Dui koole sultan bhandari', 'Ar koto khelbi khela maran ki toor hobe na' became popular songs. The songs crossed the borders of the country and came to the attention of foreign researchers. Humanism, Guruism, Spiritualism, Baulism, Prophetism, creation theory, love theory, murshid theory, Marfat theory, Gaur theory, Radha-Krishna love, social rituals, patriotism, male-female love, birth, regionalism etc have emerged in his songs. At that time on his literary work professor of Heidelberg University in Germany Hans Harder and Benjamin Krakauer, Assistant Professor in Ethnomusicology at Atlanta Emory University, USA, started research and recognized his songs as mystical songs of East Bengal. But beyond the mystical genre, Abdul Gafur Hali has composed about a thousand songs based on folk culture. The sad thing is that despite the popularity of his songs not much research work has been done. This article will try to uncover its aspects.This research has been done with mixed method such as descriptive, comparative, historical, sociological and case study.

চাবিশব্দ: আবদুল গফুর হালী, লোকগান, লোকদর্শন

ভূমিকা

বাংলা লোকসংগীতে এক নন্দিত লোকসাধক আবদুল গফুর হালী। তিনি একাধারে লোকসংগীত শিল্পী, গীতিকার, সুরকার, মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার খলিফা এবং চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় প্রথম নাট্য রচয়িতা। তাঁর রচিত গান প্রায় আড়াই হাজার। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর রচিত 'সোনা বন্ধু তুই আমারে করলি দিবানা', 'মনের বাগানে ফুটিল গো ফুল গো', 'রসিক তেল কাজলা', 'দেখে যারে মাইজভাণ্ডারে হইতেছে নূরের খেলা', 'দুই কূলে সুলতান ভাণ্ডারী', 'আর কত খেলবি খেলা মরণ কী তোর হবে না' গানগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গানগুলো দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশি গবেষকগণেরও নজরে আসে। তাঁর গানে আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মানবতাবাদ, গুরুবাদ, আধ্যাত্ম্যবাদ, বাউলবাদ, নবীতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, মুর্শিদতত্ত্ব, মারফততত্ত্ব, গৌরতত্ত্ব, রাধা-কৃষ্ণপ্রেম, সামাজিক আচার, দেশপ্রেম, নর-নারীর প্রেম, বিরহ, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি ফুটে উঠেছে। তাঁর সাহিত্যকর্মের উপর তৎকালীন জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হান্স হার্ডার এবং আমেরিকার আটলান্টা এমোরি ইউনিভার্সিটির এথনোমিউজিকোলজির ভিজিটিং

* সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

সহকারী অধ্যাপক ড. বেঞ্জামিন ক্রাকাউর গবেষণা শুরু করেন এবং তাঁর গানগুলোকে পূর্ব বাংলার মরমি গান হিসেবে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু মরমি ধারার বাইরেও আবদুল গফুর লোক সংস্কৃতি লোকমানুষকে কেন্দ্র করে প্রায় এক হাজার গান রচনা করেছেন। এই লোকসাধকের গান ব্যাপক জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও গানগুলোর তত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে তেমন গবেষণা এখনও পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি। বর্তমান গবেষণাটি তারই বিভিন্ন দিক উন্মোচনে প্রয়াসী হবে। প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক, তুলনামূলক, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও ক্ষেত্রসমীক্ষা প্রভৃতি পদ্ধতির সমবায়ে রচিত হয়েছে।

এই অনন্য প্রতিভার অধিকারী পুরোধা ব্যক্তিত্ব আবদুল গফুর হালী চট্টগ্রামের পটিয়া জেলার রশিদাবাদে ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুস সোবহান এবং মাতা গুলতাজ খাতুন। তিনি রশিদাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জোয়ারা বিশ্বম্ভর চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষালাভের সুযোগ পান। এরপর আর্থিক দৈন্য ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে আর শিক্ষার্জন সম্ভব হয়ে ওঠেনি তাঁর। জানা যায়, '১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কারণে লেখাপড়া করা হয়নি তাঁর। চোখের সামনে মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। সে সময় জাপান-জার্মানির যুদ্ধ চলছে। এসব কিছু তাঁর ভাবনার জগৎকে বদলে দিয়েছিল।'[১] মতান্তরে তাঁর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার কথা জানা যায়। তবে স্বশিক্ষিত এই লোকসাধকের সংগীতে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানর্জনেরও সুযোগ হয়নি। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আস্কর আলী পণ্ডিত ও কবিয়াল রমেশ শীল দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'আবদুল গফুর হালী ব্যক্তিজীবনে খুবই সৌখিন মানুষ ছিলেন। তিনি প্রকৃতি ও সংস্কৃতির প্রায় সকল উপাদান নিয়েই গান রচনা করেছিলেন। যেমন: কর্ণফুলী নদী, সাম্পান, মাঝি, ভোমরা, মাইট্যা কলসি, হাঁড়ি, রেলগাড়ি, সাইকেল, রিকশা ইত্যাদি। প্রেম, প্রকৃতি ও মানুষের জীবন এই তিনটিই ছিল তাঁর গানের মূল উপজীব্য বিষয়।'[২]

তিনি লোকসংগীতের প্রায় সকল শাখায় বিচরণ করেছেন। যেমন- পল্লীগীতি, আঞ্চলিক গান, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গান, মুর্শিদি গান, মারফতি গান, ঘুম পাড়ানি গান, প্রেমের গান, মা কেন্দ্রিক গান, মাইজভাণ্ডারী গান, ভাটিয়ালি গান, বিয়ের গীত, স্বাধীনতার গান, ভাষার গান, ঈদের গান, বৈশাখী গান, পরিবার-পরিকল্পনার গান, হামদ-নাত, গাছের গান, মানবতার গান, মরমি গান প্রভৃতি।

লোকগান, লোকসমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ-গাঁথা, সমাজ-সংস্কার, আচার-আচরণ, লোক-বিশ্বাস, মনন-রুচি, নীতি-নৈতিকতা, শিল্পবোধ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। আবদুল গফুর হালী তাঁর গানের মধ্যে তৎকালীন সমাজ, পরিবেশ-প্রতিবেশকে একত্রিত করেছেন। তিনি গানে লোক সমাজের বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, শাশুড়ির ও ননদীর জ্বালাতন, স্বামীর বৈদেশ গমন, বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রায় সকল বিষয় অন্তভুর্ক্ত করেছেন। এ অঞ্চলের মানুষের মন ও জীবনে তাঁর গানের বিস্তর প্রভাব রয়েছে। চট্টগ্রামের লোকসংগীত সংগ্রাহক ও লোকগবেষক ডা দীপংকর দে বলেন, 'চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৬০% গানই আব্দুল গফুর হালীর গান। তিনি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় মহলেই সমান জনপ্রিয়। উনার গান প্রায় ৮০% মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে বলে মনে করি।'[৩]

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় তিনি অসংখ্য গান রচনা করেন। তাঁর স্বদেশ, স্বজাতি, স্বভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ ছিল।' চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় সর্বাধিক গান রচনায় করায় তাকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের একচ্ছত্র সম্রাট বলা হয়। ৬০ বছর ধরে টানা গান লিখেছেন আবদুল গফুর হালী। তাঁর লেখা আঞ্চলিক গানের সংখ্যা ১ হাজার ৬০৭টি এবং মাইজভাণ্ডারী গান ১ হাজার ১২০টি।'[৪] ২০১৪ সালে প্রকাশিত আলী হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত আবদুল গফুর হালী রচিত *শিকড়* গ্রন্থটিতে স্বরলিপিসহ ১০০টি চাটগাঁইয়া আঞ্চলিক গান ঠাঁই পেয়েছে। 'তাঁর আঞ্চলিক গানের রচনা একেবারেই ছোটবেলা থেকে যখন তিনি ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়েন।'[৫] তাঁর জনপ্রিয় আঞ্চলিক গানগুলোর মধ্যে রয়েছে– ও শ্যাম রেংগুন ন যাইঅরে, বানুরে.. জ্বী, শহরত্তুন আইন্য আল্লাই। তাঁর রচিত আঞ্চলিক গানগুলোতে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনের প্রেম-দুঃখ-বিরহ সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি লিখেছেন,

'নিশি রাইতে বাঁশি বাজান কনে
অবলা পরাণডা ধরি টানে
ও সখিগো ঘরে জ্বালা বাইরে জ্বালা
বাঁশি করলো মন উতলা
প্রাণ বাঁচেনা মনের মানুষ বিনে ॥'[৬]

এ যেন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশী খণ্ডের অংশ-

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।[৭]

শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেমে যেমন একেবারেই ব্যাকুল। কৃষ্ণের বাঁশির সুর যেমন রাধার হৃদয় বধ করেছে, এখন সে সমাজ, সংসার-জাতি-কূল সব ছেড়ে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী তেমনি কাব্যের ন্যায় গফুর হালীর নায়িকা রাধা যেন প্রেমিকের বাঁশির সুরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঘরে শাশুড়ি-ননদীর চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রেমিকের সাথে মিলিত হতে ব্যাকুল হয়ে আছে। গানে বর্ণিত আছে-

ও সখীরে -
ঘরে জ্বালা বাইরে জ্বালা
বাঁশী গইল্যা মন উতলা
.....
আমি অবলা নারী
ঘরে ননদী শ্বাশুড়ি
কলঙ্কিনী হইয়্যম যদি শুনে॥[৮]

লোককবি দুরবিন শাহ-এর গানের সাথেও যেন এক অর্পূব দ্যোতনা তৈরি হয়েছে। তাঁর গানে বর্ণিত আছে–

বাঁশিতে কী মধু ভরা
আমারে করিল সারা
আমি নারী ঘরে থাকা দায়॥[৯]

আবদুল গফুর হালী চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাকে কোনভাবেই আঞ্চলিক ভাষা বলতে রাজি ছিলেন না। প্রায় দেড় কোটি মানুষের মুখের ভাষা কোনো প্রকার আঞ্চলিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ করা সমীচীন নয় বলে তিনি মনে করেন। তিনি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় সর্বপ্রথম লোকনাটক 'গুলহাবাহার' রচনা করেন। তাঁর রচিত আঞ্চলিক গান গেয়ে অনেক শিল্পী সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব, শেফালী ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ, উমা খান,কান্তা নন্দী, সেলিম নিজামী, শিমুল শীল, নুরুল আলম, ফেরদাউস হালী উল্লেখ্যযোগ্য। এ প্রসেঙ্গ আব্দুল গফুর হালীর বড় নাতি মাঈনুল হক জুয়েল বলেন, 'আমার দাদা প্রত্যেক প্রজন্মের মধ্যে শিষ্য তৈরী করে গিয়েছেন। শেফালী ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ, শিমুল শীল, নয়ন শীল উনারা তাঁর শিষ্য ছিলেন। শেষ বয়সে উনার সব শিষ্য দরবার কেন্দ্রিক ছিল। উনি বাড়ীর উঠানে তাঁদের নিয়ে গান করতে বসতেন, নতুন নতুন গান তুলতেন। এ গানগুলোর মধ্যে ধর্মীয়, মাইজভাণ্ডারী, আঞ্চলিক উর্দু, হিন্দি, ফার্সি বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রায় সব ধরনের গানই থাকতো। দাদার এসকল বৈঠকী স্মৃতি আমরা এখনও ধরে রেখেছি, এখনো প্রতি বাংলা মাসের ২২ তারিখ আমাদের বাড়ির উঠানে ভাব গানের আয়োজন করা হয়।'[১০]

আবদুল গফুর হালীর গানগুলোর মধ্যে এক বড় শ্রেণি ছিল শ্রমজীবী মানুষ। তিনি জীবন সংগ্রাম খুব কাছ থেকে পরখ করেছেন। তাই তাঁর লেখাতেও তা ফুটে উঠেছে চমৎকারভাবে। শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবানাচার, সুখ-দুঃখ, শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর গানে। গানে বর্ণিত আছে-

ঐ সাইকেল ওয়ালা বাবু যার গৈ
বেল মারি মারি
বেল মারি মারি
আঁর পরাণ নেয় কাড়ি ॥[১১]

এখানে নায়িকা তার প্রথম যৌবনে তার বন্ধুর সান্নিধ্য কামনা করে। যুবক রিকশাওয়ালা বা সাইকেলওয়ালা বেল বাজিয়ে যখন তার বাড়ির সামনে দিয়ে যায় তখন তার মনে কামনার উদ্রেক হয় এবং তাকে একান্তে কাছে পাওয়া বাসনা তার নারীমনকে ব্যাকুল করে তোলে। নায়কের ঘর্মাক্ত তপ্ত তনুকে নায়িকা তার প্রেমের পরশে শীতল করে দিতে চায়।

একসময় চট্টগ্রামের শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা অর্জনের মূল চালিকা ছিল 'বৈদেশ গমন' তথা বার্মা গমন। তারা ভাগ্য বদলের আশায় বার্মা (তথা মায়ানমার) পাড়ি জমাত। পূর্ববঙ্গ গীতিকার 'নছর মালুম' পালায় নছর এবং কবিয়াল রমেশ শীলও প্রথম জীবনে বার্মায় গিয়েছিলেন। এটা তৎকালীন চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি সংস্কৃতির মধ্যেই পড়ে। স্ত্রীকে রেখে স্বামী যখন জীবিকার তাগিদে বার্মা যেতেন তখন তাদের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের একটি বিচ্ছেদ খুব প্রবলভাবেই দেখা যেত। যেহেতু তখন মোবাইল বা যোগাযোগের অন্য কোন মাধ্যম তেমন একটা ছিল না তাই স্ত্রী বা নায়িকাকে বছরের পর বছর তার প্রিয়জনের অপেক্ষায় থাকতে হতো। গীতিকার আবদুল গফুর হালীর শৈশবকালে তাঁর দাদা সলিম উদ্দিনও রেঙ্গুন গিয়েছিলেন। তখন একে একে দিন, মাস, বছর কেটে গেলেও

তাঁর দাদা আর ফিরে আসেননি। সাত বছর পর তাঁর দাদি একদিন লোকমুখে শুনলেন, রেঙ্গুনে এক নারীকে তার স্বামী বিয়ে করেছেন। তা জানার পর থেকে তাঁর দাদি স্বামীর চিন্তায় একেবারেই ভেঙে পড়েন। বিষয়টি পনেরো বছরের ছোট্ট গফুরকে খুব নাড়া দেয়। তিনি রচনা করেন -

ও শ্যাম রেঙ্গুন ন যাইওরে.....
হনে হাইব রেঙ্গুনর হামাই অরে শ্যাম
রেঙ্গুন ন যাইওরে॥[১২]

সত্তরের দশকে সেই গান গেয়েছিলেন শেফালী ঘোষ। গ্রামোফোন রের্কডের মাধ্যমে গানটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং এটি সকল বিরহী হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। পরবর্তীকালে আবদুল গফুর হালী রচিত 'গুলবাহার' নাটকে 'ও শ্যাম বৈদেশ ন যাইওরে' গানটি পরিবেশিত হয়-

রেঙ্গুনেরঅ রেশমি শাড়ি
ন পিন্দিয়্যুম মুই অবলা নারী রে
ও শ্যাম শ্যাম রে [১৩]

বাঙালি নারীর কাছে দামি শাড়ি, চুড়ির চেয়ে তার পতির সান্নিধ্য অধিকতর আরাধ্যের বিষয়। তার একটি গানে দেখা যায় পতি বিদেশ গমনকালে বিদেশ থেকে কী আনবে তার স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলে স্ত্রী বলে,

ছেলে : বানুরে...
মেয়ে : জ্বী..
ছেলে: ও বানু...
মেয়ে : জ্বী..জ্বী...জ্বী..
ছেলে : আই যাইয়্যুম রেঙ্গুন শহর তোয়ারল্লাই আইন্যুম কি?
মেয়ে: শাড়ি চুড়ির আশা গরি রেঙ্গুন যাইতাম দি যদি
সোনার যৌবন কে এলে রাইক্কুম গামছা দি বাইন্দি॥[১৪]

নারী হৃদয়ের অব্যক্ত আর্তি আবদুল গফুর হালী সযত্নে তুলে ধরেছেন। এ যেন ভাওয়াইয়া গানের বিরহী নারীহৃদয়কে স্পর্শ করে গিয়েছে। 'ওকি গাড়িয়াল ভাই', 'ওকি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে', 'প্রেম জানে না রসিক কালাচান' ইত্যাদি গান যেন গফুর হালীর গানের বিরহ ভাবের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে। তাঁর পূর্বোক্ত গানের সাথে মিল রেখে ভাওয়াইয়া গান যেন গীত হয়েছে-

ও কি পতি ধন
প্রাণ বাঁচেনা যৈবন জ্বালায় মরি॥[১৫]

আবদুল গফুর হালী ছিলেন ধার্মিক কিন্তু উদার প্রকৃতির। আল্লাহ, নবি-রাসুলকে কেন্দ্র করে অনেক গান রচনা করেছেন। আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপেছেন অকৃতি অধম রূপে। তাঁর গানে আল্লাহ, নবী-রাসুলের মাহাত্ম্য তুলে ধরার পাশাপাশি আমাদের কৃতকর্মের বর্ণনাও তুলে ধরেছেন। তিনি গানে বর্ণনা করেন-

আল্লাহ তুমি দয়াবান না চাহিতে সব দিয়াছ
সৃষ্টির সেরা মানুষ করে এই সংসারে পাঠাইছ॥[১৬]

এ জগৎ সংসারে আমরা শত ভুল করলেও আল্লাহ কখনও নির্দয় হন না এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এছাড়াও 'আমার নবির পবিত্র নাম আল্লাহ নামের পাশে/আদম আলায়হিসসালাম দেখেছেন আরশে' এরকম অসংখ্য হামদ-নাত রচনা করেন। লালনের গানের পরম সত্য সন্ধান, হাছন রাজার গানের মরমি চিন্তা, কাজী নজরুল ইসলামের গানের চৈতন্য ও বৈষ্ণববাদ সবকিছুর প্রতিফলন আবদুল গফুর হালীর গানে প্রস্ফুটিত হয়েছে। লালনের গানে আছে-

ও, মন, বল রে সদা লায়লাহা ইল্লেল্লা ॥[১৭]

কবি নিজেকে রাধা হিসেবে কল্পনা করে কৃষ্ণপ্রেমে নিজেকে সঁপেছেন। এ গানগুলোর ভেতর দিয়ে কবি মূলত জীবাত্মা ও পরমাত্মার মেলবন্ধন তৈরি করেছেন। স্রষ্টার প্রেমে লীন হওয়া সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। গানে আছে-

১। আমি প্রেম কাননে রাধা হইয়া
কৃষ্ণের আশায় বসে রই
প্রাণ বন্ধুরে পাবো কই সই গো
প্রাণ বন্ধুরে পাবো কই॥[১৮] (রচনাকাল: ১৪-০৮-১৯৮০)

২। আমি জন্মে কেন রাধা হইলাম রে
হইলাম কেন রাধা
শ্যাম তো হইলোনা আমার
অন্তর যেমন সাদা রে
জন্মে কেন রাধা হইলাম রে॥[১৯] (০১-০৬-১৯৮২)

মা অতুলনীয়। স্বার্থের পৃথিবীতে মা কেবল নিঃস্বার্থ হোন। সন্তান প্রসবকালে মা যে যন্ত্রণা ভোগ করেন তা অবর্ণনীয়। সকল ধর্মেই মাকে ভক্তির কথা বলা আছে। গফুর হালী মাকে নিবেদন করে লিখেন-

কোলে তুলি লইল মায়ে নিজের বুকের ধন
মায়ের মনে দেয় রে দুঃখ পাপিষ্ঠ যেই জন
গফুর হালী বুঝিতেছে না যে কি ধন হারাই॥[২০]

সুফিবাদের ভক্তিমূলক গোপন রহস্যের গান মারফতি গান। 'আল্লাহ নিরাকার আর মানুষ সাকার। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে রূপ-অরূপের ব্যবধান। রুহ বা আত্মার দিক থেকে কোনো ব্যবধান নেই।'[২১] গফুর হালী পরমাত্মা আল্লাহ্‌কে নানা প্রতীকীরূপে ব্যবহার করে গুপ্তজ্ঞানকে রূপক হিসেবে এনে অনেক গান রচনা করেন। এ গুপ্ত বা বাতেন তত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ় তত্ত্ব, সাধনা ব্যতীত তা অনুধাবন করা বড়ই দুরূহ বিষয়। কবি লিখেছেন -

কাষ্ঠের উপর চামড়া দিয়া
কে বানাইলো ঢোল
সেই ঢোলেরে কে শিখাইলো
আল্লাহ আল্লাহ বোল॥[২২] (০৫-০৬-২০০৪)

আবদুল গফুর হালীর মুর্শিদের প্রতি পরম ভক্তিভাবের গানগুলোই মুর্শিদী গানের পর্যায় ভুক্ত হয়েছে। কবি এখানে মুর্শিদের প্রতি নিঃশর্ত ভক্তি নিবেদন করে তাঁর মাহাত্ম্য ও চরণাশ্রয় কামনা করেছেন। জাগতিক সকল মোহমায়া, অপকর্ম, গ্লানি, অজ্ঞতা থেকে মুক্তি চেয়েছেন। ইহকাল ও পরকালের মুক্তির বাহন হিসেবে তিনি মুর্শিদকে দেখেছেন।[২৩]

ও মুর্শিদ ও দুনিয়া বেবুঝার বাসা
চাইলাম জগৎ ঘুরি
তুমি আমার আউয়াল আখের নিদানের কাণ্ডারি॥[২৪]

মা সবসময় শিশুকে কোলে নিয়ে দোল দিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করেন। মা মনের আনন্দে গুনগুন করে গেয়ে ওঠেন গান। মায়ের অবচেতন মনের কথার বহিঃপ্রকাশ ঘটে গানের কথায়ও। গফুর হালী লিখেন -

ঘুম যারে দুধের বাচা
বাচা যারে ঘুম
ঘুমত্তুন উড়িলে বাচা
বচ্চু দিয়ুম মুই॥[২৫]

মায়ের ভাষাকে রক্ষার্থে বাংলার ছেলেদের অবদান বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তাঁদের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করে গফুর হালী রচনা করেন ভাষার গান—

বাংলা ভাষার দাবি গরি
গুলি খাইয়ে বুকে
তারা যুদি বাঁচি থাইকত
মা ডাইকত এক এক মুখে
এখন ডাকে কোটি মুখে
তোরে মা জননী॥[২৬] (২-৩-১৯৮২)

দেশের মানুষকে সচেতন করলে কবি বহু গান রচনা করেন। এর মধ্যে পরিবারপরিকল্পনার গানও রয়েছে। গানে বাল্যবিবাহের অপকারিতা, শিক্ষার গুরুত্ব, বড় পরিবারের সংকটগুলোও তুলে ধরেছেন। বাংলা লোকসংগীতের গম্ভীরা ধারার সাথে এই গানগুলোর বিষয় বস্তুগত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। গম্ভীরায় যেমন সামাজিক নানা অসঙ্গতি তুলে ধরা হয় তেমনি তাঁর গানেও তিনি লিখেন-

চল্লিশ ন পুরাতে অইলে
দুই চাইর পোয়ার বাপ
শিক্ষা দীক্ষা ন পাইলে
পোয়া হই কী লাভ
অল্প বয়সে বিয়া গইল্যে
অযতনে আয়ু ক্ষয়॥[২৭]

পহেলা বৈশাখ বাঙালির একটি সর্বজনীন লোকউৎসব। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদযাপিত হয় নতুন বছর। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি

মন্ত্রণালয়ের আবেদনক্রমে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশের 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' ইউনেস্কোর মানবতার অধরা বা অস্পর্শনীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান লাভ করে।[২৮] বৈশাখকে কেন্দ্র করে এদেশে গ্রামীণ মেলা, লোকক্রীড়াসহ বিভিন্ন লোকউৎসবের আয়োজন করা হয়। পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে কবি আবদুল গফুর হালী লিখেন–

কারো বাড়ীর নাটোয়া নাচের
বাজার ঢাক ঢোল
বিলত বৈশাখী মেলা
কাণ্ড হুরুস্থুল
ভাত পানি খাই নোয়ার বেয়াইরে
মেলাত যাইব লই॥[২৯] রচনাকাল : ৮-১২-২০১৩ খ্রি

গানকে তিনি ইবাদতের সামিল মনে করতেন। তিনি গানের সুরে সুরে স্রষ্টাকে খুঁজেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'গান হচ্ছে আমার কাছে ইবাদত। আমি গানের মাধ্যমে স্রষ্টাকে তালাশ করি,তাঁকে পাবার সাধনা করি। সবাই যাবে, আমিও যাবো তাঁর জন্য মন কাঁদছে।'[৩০]

এ যেন সুফি বৈষ্ণবদের সাধন ভজন-

বীণার নামাজ, তারে তারে, আমার নামাজ কণ্ঠে গাই॥[৩১]

গান যারা হারাম মনে করেন তাদেরকে খুব কটাক্ষ করেই তিনি লিখেন,

গানের অর্থ না বুঝিলে
তার লাগিয়া গান হারাম
এক মণ স্বর্ণ দিলে
হয় না একটা গানের দাম॥[৩২]

সুরের মাহাত্ম্য এতটাই প্রখর যে সাপুড়িয়ার বাঁশির সুরে মাতাল হয়ে সাপ তার জীবন সঁপে দেয়। কোরান, আযান, প্রকৃতি সবকিছুই সুরের আবহে মাতাল। সম্রাট আকবর তার রাজসভাতে গান শোনানোর জন্য তানসেনকে সমর্যাদায় রেখেছিলেন গানটিতে এ বিষয়টি তুলে ধরেন। অপরদিকে গানের শেষ অন্তরায় সোনায় তামা মিশালে কখনও সোনা হয় না তেমনি গান নকল করলে তা তামা রূপেই থাকে তা সোনায় পরিণত হয় না এই বিষয়টিও তুলে ধরেছেন।

তিনি আপাদমস্তক আধ্যাত্মিক চেতনা লালনকারী একজন মানুষ ছিলেন। তাই তাঁর গানে মায়াবাদ, একেশ্বরবাদ, ভক্তিবাদ, ফানাতত্ত্ব, পিরতত্ত্ব, সুফিতত্ত্ব, সবকিছুই একত্রিত হয়েছে। গফুর হালী জীবিত অবস্থায় তাঁর কবর বানিয়ে রেখেছিলেন। জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টিও স্রষ্টার খেলা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। আবদুল গফুর হালী মাইজভাণ্ডারী গান রচনা শুরু করেন স্বাধীনতাপূর্ব থেকেই। তিনি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম মাইজভাণ্ডার দরগাহ শরীফে হাজির হন। মাইজভাণ্ডারী গানের সম্মোহনী শক্তি ছন্দ, তাল, তান ও বাদ্য গফুরের চিত্তকে চঞ্চল করে তোলে। এ গানের শিল্পীগণের গুরু শিষ্যের ভাব, মিলন ও বিনয় তাকে আকৃষ্ট করে। সেই প্রেক্ষাপটে গফুর হালী বলেন, 'মনে হলো আমার ওপর অদৃশ্য শক্তি ভর করেছে। মাইজভাণ্ডারের প্রেমসাগরে নিজেকে

হারিয়ে ফেললাম। ওখান থেকে বাড়ি ফেরার পর আমাকে কে যেন বলছে– লেখ লেখ।' একদিন গান বাঁধলাম–

আর কত খেলবি খেলা
মরণ কী তোর হবে না
আইল কত গেলো কত
কোথায় তাঁদের ঠিকানা॥[৩৩]

ওই সময় আবদুল গফুর তরিকতের দীক্ষায় মাইজভাণ্ডারের পির শফিউল বশর মাইজভাণ্ডারী (রঃ) হাতে মুরিদ হলেন। পির সাহেব কেবলা একদিন গফুরকে হালী উপাধি দেন।

গানের ভেতর মানব জাতির পৃথিবীতে আগমন প্রত্যাগমনের কথা খুব সুন্দরভাবেই তুলে ধরেছেন। মরণের ভয় মানুষকে সকল অপকর্ম থেকে দূরে রাখে। নশ্বর এ ধরায় কেবল মৃত্যুই সুনিশ্চিত। পবিত্র কোরানেও আছে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আধ্যাত্মিক সাধকগণ মানুষের আগমন প্রত্যাগমন নিয়ে বরাবরই চিন্তা করে গিয়েছেন। 'আমি কে? কোথা হতে এলাম, আবার কোথায় চলে যাবো?- এ সকল আত্ম-জিজ্ঞাসা কবিমনকে কাতর করে তোলে। তিনি অসংখ্য মাইজভাণ্ডারী গান রচনা করেন। তাঁর রচিত জনপ্রিয় কয়েকটি মাইজভাণ্ডারী গান হলো -

দেখে যারে মাইজভাণ্ডারে হইতেছে নূরের খেলা
নূরে মাওলা বসাইলো প্রেমের মেলা॥[৩৪]

এবং

দুই কূলে সুলতান ভাণ্ডারী দুইকূলে সুলতান
এ সংসারে কে আর আছে এমন দয়াবান॥[৩৫]

মাইজভাণ্ডারী গান মূলত আশেক–মাশুকের গান। এ গানে স্রষ্টা, নবী-রাসুলগণ এবং পিরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। মাইজভাণ্ডারী গানের প্রবক্তা মনে করা হয় মৌলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরীকে। এ গান মাইজভাণ্ডারী তরিকা ও মাইজভাণ্ডারী পির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক গান। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই তরিকার উদ্ভব।[৩৬]

এই মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী। মাইজভাণ্ডারী গানগুলো কয়েকটি পর্বে বিকশিত হয়েছে। আবদুল গফুর হালী কবিয়াল রমেশ শীলের পরবর্তী ধারার মাইজভাণ্ডারী গানের প্রবর্তক। তাই আবদুল গফুর হালীর মাইজভাণ্ডারী গান নিয়ে একটি প্রবন্ধে বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ও গবেষক শামসুজ্জামান খান বলেন,

> 'এতো কিছুর মধ্যে আব্দুল গফুর হালীর গানের ভুবনের সবচেয়ে গুরুত্ব ও তাৎপর্যের যে পরিচয় তিনি এবং তত্ত্বজ্ঞানীরা দিয়ে থাকেন তা হলো, তাঁর রচিত মাইজভাণ্ডারী গান। মাইজভাণ্ডারীর রচয়িতাদের মধ্যে রমেশ শীল ছিলেন অগ্রগণ্য। কিন্তু রমেশ শীলের তিরোধানের পর মাইজভাণ্ডারী গানের জগতে এক ধরনের শূন্যতা দেখা দেয়, গফুর হালী সেই শূন্যতা সৃষ্টি হতে দেননি। তিনি মাইজভাণ্ডারী গান রচনার মাধ্যমে একদিকে যেমন গুরুবাদী সাধনায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি মাইজভাণ্ডারী গানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন।'[৩৭]

১৯৬৩ সাল থেকে বেতারে গফুরের গানের প্রচার শুরু হলেও প্রথম সাত আট বছর তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তাঁর গানগুলো তখন সংগৃহীত নামেই চালিয়ে দেওয়া হতো। সম্ভবত এ কারণে তাঁর লেখা অনেক গানে রচয়িতার নাম অনুপস্থিত। গফুর হালী খুব আফসোস করেই বলেন,' আস্কর আলী পণ্ডিত, রমেশ শীল, গফুর হালী তারা তো তাদের জনপ্রিয় গান থেকে অর্থ কড়ি কিছুই চায় না বরং রচয়িতা হিসেবে তাদের নাম ব্যবহার করুক এইটুকুন চাওয়া।'

১৯৬৪ সালে রচিত শিল্পী কল্যাণী ঘোষের কণ্ঠে গীত 'রসিক তেল কাজলা ঐ লাল কোত্তাওয়ালা' গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। আবদুল গফুর হালীর এ গানটি তখন প্রত্যকের মুখে মুখে শোনা যেত। বর্তমান প্রজন্মের কাছে এ গানটি সর্বাধিক জনপ্রিয় করে তুলেছেন শিল্পী শিরিন। চমকপ্রদ কম্পোজিশন ও গায়কি এ গানটিকে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে-

রসিক তেল কাজলা
ঐ লাল কোত্তাওয়ালা
দিলি বর জ্বালারে
পাঞ্জাবীওয়ালা॥
সোনাবন্দু যদি ভ্রমর হইত
মনেরি বাগানে বসি মধু খাইত
খেলত প্রেমের খেলা
ঐ লাল কোত্তাওয়ালা॥[৩৮]

১৯৬৯ সালে আবদুল গফুর হালী *তত্ত্ববিধি* গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই বইয়ের শুরুতে 'সমীপে' অংশে গফুর হালী বলেন, 'তত্ত্ববিধি বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯ ইংরেজিতে। বই শেষ হয়ে যাওয়ার পর অনেক আশেকি ভাই-বোনদের অনুরোধ সত্ত্বেও আর্থিক আনুকূল্যের দরুণ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা এতদিন আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।[৩৯] পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে ৪০টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়। এর মধ্যে ২/৩টি গান মাইজভাণ্ডারী, গুরুতত্ত্ব ও মুর্শিদতত্ত্বের উপর রচিত।[৪০] আর্থাৎ কালজয়ী গীতিকার তখন লোকগানের সকল শাখায় বিচরণ করছিলেন। তবে 'লোকগবেষক শামসুল আরেফীন আবদুল গফুর হালীর গান রচনার সময়কে দুইপর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্যায়, গান রচনার শুরু থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়, ১৯৬৯ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। প্রথম পর্যায়ে আবদুল গফুর হালীর গানগুলো রচিত হয় সাধনতত্ত্ব তথা মরমিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের গানগুলো মাইজভাণ্ডারী গুরু-মুরশিদ বিষয়ক। উপরোক্ত বিভাজনটি বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা দুইধারাতেই মরমি বা অধ্যাত্মবাদী ভাবধারার কথাই বলা হয়েছে; লৌকিক জীবন সম্পৃক্ততার কথা কোন কালপর্বে সেটি বলা হয়নি।'[৪১]

অথচ আবদুল গফুর হালীর লৌকিক প্রেমের গানগুলো গফুর হালীকে অনন্য মর্যাদায় আসীন করেছে। যেমন 'সোনা বন্ধু তুই আমারে করলি দিওয়ানা', 'মনের বাগানে ফুটিল ফুলরে রসিক ভ্রমর আইল না' গানটি ১৯৬৯ সালের ১৫ জুন রচিত, 'বেয়াই আইস্যে বেয়াইরি বাড়িত/মিষ্টি পাইল্যা লই'খ্যাত বৈশাখী গানটি ২০১৩ সালের ৮ ডিসেম্বর, 'ঘুম যারে দুধের বাচ্চা/ঘুম যারে তুই

বাচা'খ্যাত ঘুম পাড়ানি গানটি ১৯৬৩ সালের ১১ জুন রচিত এরকম আরও অসংখ্য গান রয়েছে। গফুর হালীর গান ছিল প্রকৃতির মতোই স্বাধীন। সাধারণত মানুষের আধ্যাত্মিক কোনো দীক্ষায় প্রভাবিত হলে তাঁর রচনায়ও তা প্রতিফলিত হতে দেখা যায় কিন্তু গফুর হালী এক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এদিকে গিয়েছেন। নিজেকে ছাপিয়ে গিয়েছেন প্রতি পদক্ষেপে। তিনি আধ্যাত্মিক ধারায় মদদপুষ্ট হলেও তিনি এরপর শুধু গানের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং পরিবেশ প্রতিবেশ, সমাজ-সংস্কৃতির প্রায় সব বিষয়কে কেন্দ্র করেই তিনি গান করেছেন। মূলত প্রকৃতি ও প্রেমই তাকে সকল প্রকার গানের রসদ জুগিয়েছে।[৪২]

অনেক সময় লৌকিকতার অন্তরালে আধ্যাত্মিকতাকে এনেছেন সুনিপুণভাবে। আবদুল গফুর হালী ছিলেন অধ্যাত্ম প্রেমসাধক। তিনি রূপকের আড়ালে আধ্যাত্মিকতাকে দেখিয়েছেন খুব সাবলীলভাবে। তাঁর সহজ-সরল ভাষা-মাধুর্যপূর্ণ গানগুলোকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। বিখ্যাত দুটি গান—

মনের বাগানে ফুটিল ফুল গো
রসিক ভ্রমর আইলো না
ফুলের মধু খাইলো না॥[৪৩]

এবং,

পাড়ের আশায় বইসা রইলাম
বন্ধুর দেখা পাইলাম না॥[৪৪]

এখানে রসিক ভ্রমর এবং বন্ধু একজনই। তিনি এখানে পরম শ্রদ্ধায় আরাধ্য ধন স্রষ্টাকেই বুঝিয়েছেন।

১৯৮৯ সালে আবদুল গফুর হালীর *জ্ঞানজ্যোতি* প্রকাশিত হয়। এতে মূলত মাইজভাণ্ডারী গান স্থান পায়। গানগুলোতে সর্বোপরি কবি গফুর হালীর আত্মনিবেদন প্রকাশ পেয়েছে। আধ্যাত্মিক সাধন-রীতির অপরূপ অনুষঙ্গ সংগীতের মাধ্যমেই পরম বন্ধুকে নিরন্তর খুঁজে ফেরেন শিল্পী আবদুল গফুর হালী। গফুর হালীর সংগীতে সেই 'বন্ধু'র মোহন রূপ পরিস্ফুট, সেই বন্ধুকে পাওয়ার পথও তিনি নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন, তাই তিনি লিখেন -তোরা ভাল, মন্দ যা খুশি বল পরওয়া আমি করি না ভাণ্ডারী নামেতে আমি দিওয়ানা।[৪৫] *জ্ঞানজ্যোতি* গীতিকাব্যে 'আমার কিছু কথা' অংশে আবদুল গফুর হালী লিখেছেন, 'মহাজ্ঞানসমুদ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই পবিত্র দরবারে আধ্যাত্মিক ফয়েজের জন্য মুক্তির আশায় বৎসরে অন্তত তিনবার হাজিরা দেয়। আমিও এই দরবারের নগণ্য একজন। সসীম জ্ঞান নিয়ে অসীম সম্বন্ধে লিখতে যদি কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, তা ক্ষমার চোখে দেখলে বাধিত হব।'[৪৬]

আবদুল গফুর হালীর মাইজভাণ্ডারী গান নিয়ে জার্মানির হালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণামূলক বই বেরিয়েছে। জার্মানির হালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতবর্ষ বিষয়ক দর্শন শাস্ত্রের সাবেক সহকারী অধ্যাপক বর্তমান হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হানস হারডার ১৯৮৯ সালের দিকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি চট্টগ্রামে মাইজভাণ্ডারসহ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন এবং তখনই গফুর হালীর সাথে যোগাযোগ হয় তাঁর। গফুর হালীর জীবন ও গান নিয়ে ড. হানস্ হারডারের লেখা *ডার ফেরুকটে গফুর, স্প্রিখট (পাগলা গফুর, বলেন)* নামের গবেষণা গ্রন্থটি ২০০৪ সালে

প্রকাশিত হয়। এতে গফুর হালীর ৭৬টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রন্থটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে।"[৪৭]

সুফি গানে আবদুল গফুর হালীর অবদানের উপর গবেষক হান্স হার্ডার ইংরেজিতে নিবন্ধ রচনা করেন।[৪৮] তিনি গফুর হালী সম্পর্কে লিখেন, 'আব্দুল গফুর হালীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রি বা উপাধি না থাকলেও নিজের চেষ্টায় তিনি অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছেন।'[৪৯]

২০১২ সালে আবদুল গফুর হালী প্রকাশ করেন গীতিকাব্য 'সুরের বন্ধন' গ্রন্থটি। এটি তাঁর জীবদ্দশায় সর্বশেষ ও ৪র্থ গ্রন্থ। এতে মোট ৩০টি গান স্থান পেয়েছে। গানগুলো ভব সংগীত, ভাব সংগীত, নবীসংগীত, বাউল ভাবাত্মক এবং সর্বধর্মকেন্দ্রিক। এ গ্রন্থে মূলত মাইজভাণ্ডারী গানকে প্রাধান্য দিলেও গানের প্রকৃতিগত অনেক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এ গ্রন্থে শফি বাবা অর্থাৎ বাবা গোলামুর রহমানের ছেলে মাওলানা শফিউল বশর, যাঁর কাছে তিনি বেলায়েত প্রাপ্ত হন, তাঁর উদ্দেশ্যে সরাসরি নাম উল্লেখ করে ২টি গান রচনা করেন। তিনি গানে মওলা, মওলাজী, দয়াল, তুমি, শফিবাবা, বাবাজান প্রভৃতি সম্বোধনসূচক শব্দ ব্যবহার করেন।

২০১৩ সালে প্রকাশিত হয় আলী হোসেন সম্পাদিত আবদুল গফুর হালীর *শিকড়* গ্রন্থটি। এতে পল্লীগীতি, মাইজভাণ্ডারী, দেশাত্মবোধক, প্রেমমূলক গানসহ বৈচিত্র্যময় ১০০ গানের স্বরলিপি ঠাঁই পেয়েছে ।

২০১৪ সালের ১০ মার্চ তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী রাজিয়া বেগমের মৃত্যু হয়। কবির গান রচনায় তাঁর স্ত্রীর অবদান অনেক। টানাপোড়েনের সংসারেও তিনি স্ত্রীর অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন। প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মাটিকে উদ্দশ্যে করে গফুর হালী লিখেন-

> ও মাটি
> তোর কাছে আমানত দিলাম
> আমার বুকের ধনরে
> রেখে দিস তুই আপন করে
> করিয়া যতনের করিয়া যতন॥[৫০]

পরবর্তীকালে ২০১৫ সালে গবেষক ড. হানস হায়ডারের বইয়ে পুনরায় মাইজভাণ্ডারী গান, গীতিকারগণের কথা আলোচিত হয়।"[৫১] ২০১৫ সালে আবদুল গফুর হালীর *চাঁটগাইয়া নাটক সমগ্র* প্রকাশিত হয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহ হলো– গুলবাহার, নীলমণি, কুশল্যা পাহাড়, চাটগাঁইয়া সুন্দরী, সতী মায়মুনা, আশেক বন্ধু, আশেক বন্ধু, ইত্যাদি। এ গ্রন্থে 'টলমল মানবজীবন কচুপাতার পানি যেমন' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন ড. হান্স হার্ডার। সেখানে তিনি আবদুল গফুর হালী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন করেন:

> আব্দুল গফুর হালীর গান পড়তে পড়তে, তাঁর সংস্পর্শে এসে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে বিচ্ছেদের গানের বিচ্ছেদটা কত তীব্র, কত সার্বভৌমিক, কত আধুনিক হতে পারে। ভক্তির ভাব-জগতের হাতেখড়ি আমি তাঁর কাছেই পেলাম। আর এই শিক্ষা শুধু মুসলমানদের জন্য নয়। আমি তো মুসলমানই নই, বরং এক অর্থে এটা মানুষ মাত্রেরই যথার্থ অর্থে 'মানুষ' হওয়ার একটা পদ্ধতি।[৫২]

আবদুল গফুর হালী তাঁর সারাটা জীবন গানের ভেতরেই অতিবাহিত করেছেন। তিনি মৃত্যুকে প্রেমে আলিঙ্গন করেছেন খুব স্বাভাবিকভাবেই। তিনি লিখেন-

নাইয়রী নাইয়র হলো শেষ
এইবার চল আপন দেশ
তোমার জীবন খাতায় লেখা আছে
সোয়ামীর আদেশ॥[৫৩]

কবিয়াল বিজয় সরকারের আত্মকথনের সাথে তাঁর গানে দর্শনগত সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি লিখেন-

এই পৃথিবী যেমন আছে তেমনি ঠিক করে
সুন্দর এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে ॥[৫৪]

কবি নিজেকে নাইয়রের সাথে তুলনা করেছেন। নতুন বউ যেমন নাইয়র যায় তেমনি তিনিও পৃথিবীতে নাইওর এসেছেন। বাপের বাড়ি অর্থাৎ যেটা আসল দেশ তা হলো পরপার। তাই আল্লাহর ডাকে তিনি পরপারে সাড়া দেন। তিনি ২০১৬ সালের ২১ ডিসেম্বর শেষ নাইওর যান। ২০১৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর *দিওয়ানে মাইজভাণ্ডারী* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এতে মাইজভাণ্ডারী গান ও সুফী দর্শন ফুটে উঠেছে।

আবদুল গফুর হালীর সাহিত্যকর্ম তথা লোকগানগুলো বিশ শতকের এক অনন্য বিস্ময়। লোককবি লালন শাহ, হাছন রাজা, রাধারমণ দত্ত, দুদ্দু শাহ, কবিয়াল রমেশ শীলের পর এই অনন্য লোকসাধক বহুমাত্রিক গান রচনা করে বাংলা গানের ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি প্রায় সকল লোকসাধকগণের দর্শনকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর গানে লালনের উদার মানবতাবাদ এবং শাহ আবদুল করিমের লৌকিক প্রেমবাদ যেমন প্রকাশ পেয়েছে আবার সুফিবাদের চরম উৎকর্ষ সাধনও দৃশ্যমান হয়েছে। তিনি সারাজীবন তাঁর গানের মধ্য দিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের চিন্তাকে একসূত্রে বেঁধেছেন। তাই তাঁর এ গান ও গানের দর্শন বাংলার লোকসমাজের সাংস্কৃতিক ও মরমি চিত্তের বাহন রূপে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

তথ্যনির্দেশ

১ মাসুম আলী, 'আবদুল গফুর হালীকে মনে রাখেনি কেউ!' (ঢাকা : প্রথম আলো, ৯ আগষ্ট ২০১৯), সময়: ৫:২৪

২ ক্ষেত্রসমীক্ষা-১
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: নাদিরা ইসলাম
নাম: জব্বার হোসেন
পেশা: ক্যান্টিন ম্যানেজার
বয়স : ৪০ বছর
সময় ও তারিখ : ০৭.১০.২০২৪ সময় : বিকাল -৩ টা
উপস্থিত দু'জন ব্যক্তির নাম: রাজন সরকার ও বিনয়সূত্রধর (শিক্ষার্থী, চ.বি.)

৩ ক্ষেত্রসমীক্ষা-২
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: নাদিরা ইসলাম
নাম: দীপংকর দে
পেশা: ডাক্তার
বয়স : ৪৫ বছর
সময় ও তারিখ : ০৮.১০.২০২৪ সময় : সকাল ১০টা
উপস্থিত দু'জন ব্যক্তির নাম: রাজন সরকার ও বিনয় সূত্রধর (শিক্ষার্থী, চ.বি.)

৪ 'আবদুল গফুর হালী আঞ্চলিক ও মরমি গানের কালজয়ী স্রষ্টা' (২১ডিসেম্বর ২০২৩) http:/www.news24.com

৫. পূর্বোক্ত, ক্ষেত্রসমীক্ষা।

৬ আবদুল গফুর হালী, *চাঁটগাইয়া গান শিকড়* (চট্টগ্রাম : আবদুল গফুর হালী ফাউন্ডেশন ২০১৪), পৃ. ২০৬

৭ ড. শিশির কুমার সিংহ (সম্পাদিত), *কবি বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন ২০১১), পৃ. ২৭৪

৮ আবদুল গফুর হালী আঞ্চলিক ও মরমি গানের কালজয়ী স্রষ্টা (ঢাকা: নিউজজি২৪.কম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৩)

৯ শাহ আবদুল ওদুদ, *আল্লামা দুর্বিন শাহ* (সিলেট : বার্সিয়া প্রকাশনী), পৃ: ২৮

১০ ক্ষেত্রসমীক্ষা-৩

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: নাদিরা ইসলাম

নাম: মাঈনুল হক জুয়েল

পেশা: ব্যাংকার

বয়স : ৩৫ বছর

সম্পর্ক : আবদুল গফুর হালীর বড় নাতি।

সময় ও তারিখ : ২৮.০৯.২০২৪ সময় : রাত ১০টা

উপস্থিত দু'জন ব্যক্তির নাম: রাজন সরকার ও বিনয় সূত্রধর (শিক্ষার্থী, চ.বি.)

১১ আবদুল গফুর হালী, *চাঁটগাইয়া গান শিকড়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

১২ ড. শফিউল আযম ডালিম, *চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি* (চট্টগ্রাম : বলাকা প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৭৩

১৩ আবদুল গফুর হালী, *চাঁটগাইয়া গান শিকড়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ভূমিকাংশ।

১৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫

১৫ ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসংগীত : ভাওয়াইয়া* (ঢাকা: গতিধারা প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ৫৫

১৬ নাসির হায়দার (সম্পাদিত), *আবদুল গফুর হালী'র গীতিকাব্য সুরের বন্ধন* (চট্টগ্রাম : আবদুল গফুর হালী ফাউন্ডেশন, ২০১৩), সূচিপত্রের পূর্ব অংশ।

১৭ ম. মনিরউজজামান, *সাধক কবি লালন কালে-উত্তরকালে* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৯), পৃ. ৫৯

১৮ নাসির উদ্দিন হায়দার (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

১৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

২০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

২১ ওয়াকিল আহমদ, *মারফতি ও মুর্শিদি গান* (ঢাকা: গতিধারা প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ১০

২২ নাসির উদ্দিন হায়দার (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

২৩ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত (মারফতি ও মুর্শিদি গান), পৃ. ৫৩

২৪ নাসির উদ্দিন হায়দার (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭

২৫ আবদুল গফুর হালী, *চাঁটগাইয়া গান শিকড়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০

২৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯

২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২

২৮ হোসেন মোছাব্বের, *মঙ্গল শোভাযাত্রার বিশ্ব স্বীকৃতি এল যেভাবে* (ঢাকা: প্রথম আলো, ১৪ এপ্রিল ২০১৭)

২৯ আবদুল গফুর হালী, *চাঁটগাইয়া গান শিকড়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯

৩০ নাসির উদ্দিন হায়দার (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

৩১ আহমদ শরীফ, *বাউল ও সুফী সাহিত্য* (ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশনা, ২০১০), পৃ. ৬৫

৩২ নাসির উদ্দিন হায়দার (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

৩৩ মোহাম্মদ শেখ সাদী, *চট্টগ্রামের লোককবি ভাবসাধনার বৈচিত্র্য সন্ধান* (চট্টগ্রাম : নন্দন বইঘর, ২০২০), পৃ. ১২৩

৩৪ নাসির উদ্দিন হায়দার (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

৩৫ নাসির উদ্দিন হায়দার (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

৩৬ শাহিদা খাতুন (সম্পাদিত), লোকউৎসবে ঐতিহ্য চেতনা (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), পৃ. ৫৭

৩৭ আবদুল গফুর হালী, দিওয়ানে মাইজভাণ্ডারী (চট্টগ্রাম : সুফী মিজান ফাউন্ডেশন, ২০১৭), পৃ. ভূমিকাংশ

৩৮ আবদুল গফুর হালী, *চাঁটগাইয়া গান শিকড়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২

৩৯ আবদুল গফুর হালী, তত্ত্ববিধি (চট্টগ্রাম : তারা প্রিন্টিং প্রেস ১৯৬৯), পৃ. সমীপে অংশ

৪০ মোহাম্মদ শেখ সাদী, পূর্বোক্ত।

৪১ পূর্বোক্ত।

৪২ ক্ষেত্রসমীক্ষা-৩, পূর্বোক্ত।

৪৩ আবদুল গফুর হালী, *চাঁটগাইয়া গান শিকড়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮

৪৪ আবদুল গফুর হালী, *চাঁটগাইয়া গান শিকড়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪

৪৫ নাসির হায়দার, ড.হানস ও ড. বেঞ্জামিনের গবেষণা, আবদুল গফুর হালীর সাধন সংগীতের রূপ সন্ধান (চট্টগ্রাম : *দৈনিক আজাদী*, ২০১৫)

৪৬ আবদুল গফুর হালী, জ্ঞানজ্যোতি (চট্টগ্রাম :তারা প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৯), পৃ. ৫০

৪৭ Hans Harder, Sufism and Saint veneration in contemporary Bangladesh, The maijbhandadari of Chittagong (Routledge: 2015) 5th and 6th contents.

৪৮ Hans Harder, ibid.

৪৯ নাসির হায়দার, 'গানের সাধক গফুর হালী' (চট্টগ্রাম : *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০১০)

৫০ আবদুল গফুর হালী, 'ভূমিকাংশ', *চাঁটগাইয়া গান শিকড়*, পূর্বোক্ত।

৫১ Hans Harder, ibid.

৫২ আবদুল গফুর হালী, *চাঁটগাইয়া নাটক সমগ্র* (চট্টগ্রাম :সুফী মিজান ফাউন্ডেশন, ২০১৫)

৫৩ আবদুল গফুর হালী, *দিওয়ানে মাইজভাণ্ডারী* (চট্টগ্রাম : সুফী মিজান ফাউন্ডেশন, ২০১৭), পৃ. ভূমিকাংশ

৫৪ মহসিন হোসাইন, *জীবনী গ্রন্থমালা বিজয় সরকার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), পৃ. ৬৬

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৪, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২৪

রবীন্দ্রসংগীতের বাণীতে মৃত্যুচিন্তার প্রতিফলন

নুসরাত জাহান প্রভা*

Abstract

Death is real and ineluctable. Several artistries of creation can be observed especially in the words of poets and writers. Rabindranath has written about death in diverse ways, along with the description of creation. The theme of 'death' is specially mentioned in Rabindranath's treatise 'Geetbitan' in particular through the different 'Parjaya' of the songs. An appraisal of Rabindranath's writings makes it clear that 'death' is not only funeral, but the manifestation of the repletion of a creation, which remains within us as the impetus for further creation. The research has been done by combining 'Text Analysis Method' and 'Descriptive Method'. Reflection of death thoughts in Rabindranath's music is analyzed in the discussion article. In such a way that Rabindranath holds God as truth, he also declares 'death' to be as true as God. This profound thirst of essence and questioning of the poet about death is repeatedly expressed in his music. Therefore, if we are looking for Rabindranath's vision of death and death perceiving, we hope that the analysis of his lyrics is an essential means.

চাবিশব্দ: রবীন্দ্রনাথ, বাণী, মৃত্যুচিন্তা, রবীন্দ্রসংগীত, গান।

ভূমিকা

বিষয়ভিত্তিক বাংলা গানের জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রধান উল্লেখ্য একটি নাম। তাঁর গানের বাণীর বিষয়সমূহ আমাদের জীবনের সাথে বাস্তবিকভাবে সম্পর্কিত। রবীন্দ্রসংগীতের বাণীতে একটি বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে 'মৃত্যু' প্রসঙ্গ। 'মৃত্যু' বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কী ভেবেছেন এবং রবীন্দ্রসংগীতে এর প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'মৃত্যুশোক' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন-

> আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।[১]

শিশু বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে সকল মৃত্যু অনায়াসে পাশ কাটাতে পেরেছিলেন, অধিক বয়সে সেই মৃত্যু প্রভাব তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। জীবনের মধ্যে কোথাও কিছুমাত্র ফাঁকা নেই বরং সমস্তই হাসিকান্নায় নিরেট বোনা তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।[২] রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুচিন্তাকে চরমভাবে ধারণ করেছিলেন বলেই তাঁর রচনাসমূহে বিষয়টির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান' গ্রন্থের বিভিন্ন পর্যায়ের গানের বাণীতে মৃত্যুকে তিনি গান, প্রিয়া, প্রেয়সী, বর, বধূ, বন্ধু, প্রিয়তম প্রভৃতি রূপে কল্পনা করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তার প্রবল প্রকাশ রয়েছে বলেই তিনি তাঁর গানের বাণীতে জীবনকে 'মরণের তরী' বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৩]

---

* সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে মৃত্যু এসেছে নানা রূপে। তাঁর গানে মৃত্যু এসেছে প্রকট হয়ে, কখনওবা প্রচ্ছন্ন হয়ে। মৃত্যু মানে শেষ নয়, মৃত্যুকে তিনি নিয়ে গেছেন অনন্ত জীবন ধারার পথে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ভাবনার প্রকাশ তাঁর সংগীত বিষয়ক নানান গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে। *গীতবিতান*, *গীতাঞ্জলি*, *গীতিমাল্য*, *গীতালি*, *নৈবেদ্য*, *সংগীতচিন্তা*সহ *ছিন্নপত্রাবলী*তে 'মৃত্যু' বিষয়টি নানানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থের 'মৃত্যুশোক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'মৃত্যু' বিষয়টিকে যে আপন করে পরবর্তী জীবনস্রোতে প্রবাহিত করেছেন তার বর্ণনা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসংগীত' থেকে শুরু করে তাঁর শেষ রচনা পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্থানে বারবার মৃত্যুচেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যুভাবনা কী করে রবীন্দ্রসংগীতে প্রতিফলিত হয়েছে, তা যাচাই করা এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। গবেষণা করতে গিয়ে পাঠবিশ্লেষণ পদ্ধতি ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে অনুসন্ধান করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ 'মৃত্যু' বিষয়টি নিয়ে কী ভেবেছেন। তারপর রবীন্দ্রসংগীতে মৃত্যুচিন্তার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতে মৃত্যুচিন্তার প্রতিফলন কতটুকু ঘটল তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রমননের 'মৃত্যু' বিষয়ক চিন্তার প্রতিফলনে যে সকল গান সৃষ্ট হয়েছে, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীরা সে সকল গানের বাণীর অন্তর্নিহিত ভাব ধারণ করে পাঠ ও সংগীত পরিবেশন করলে তা আরও হৃদয়গ্রাহী ও অর্থবহ হয়ে উঠবে।

সাহিত্য-পর্যালোচনা ও গবেষণাকর্মের তাৎপর্য

মুদ্রা নবপর্যায়, চতুর্থ বর্ষের সাহিত্য পত্রিকায় সুধীর দত্ত রচিত 'অনধিকারীর বিহঙ্গদৃষ্টি: রবীন্দ্রগান ও আধ্যাত্মিকতা'[৪] শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদর্শন চিন্তা প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে তবে রবীন্দ্রসংগীতের বাণীতে মৃত্যুচিন্তার প্রতিফলন সম্পর্কে আলোচনা নেই। হায়াৎ মামুদের *মৃত্যুচিন্তা রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জটিলতা*[৫] গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদর্শনের সাথে অন্যান্য কবির রচনায় মৃত্যুভাবনার তুলনা প্রকাশ পেয়েছে তবে, রবীন্দ্রসংগীতের বাণীতে মৃত্যুভাবনা প্রসঙ্গটির উল্লেখ নেই। ড. দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার রচিত *রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন*[৬] গ্রন্থে কবির শেষ জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জি ও সংগীতের উপর চিন্তাধারার প্রকাশ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতের গানের বাণী বিশ্লেষণ করে মৃত্যুচিন্তার প্রতিফলন সম্পর্কে অনুধাবনের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ, রবীন্দ্রসংগীতের বাণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা অনুসন্ধানটি অভিনব।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে মৃত্যুচিন্তা

মৃত্যুর সাথে রবীন্দ্রনাথের 'স্থায়ী পরিচয়ের' পরে তিনি উপলব্ধি করেন, জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়ে যে একটি অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হয়েছিল, সেটিই তাঁকে আরও প্রবলভাবে নিত্যক্ষণ আকর্ষণ করেছিল। অর্থাৎ, এই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়েই তিনি পৃথিবীর প্রকৃত সৌন্দর্যকে আরও

গভীররূপে অনুভব করেছিলেন। আমাদের মানবমনের ভেতর মৃত্যু যেখানে শুধুমাত্র শোক, বিচ্ছেদ এবং সমাপ্তি, রবীন্দ্রনাথ সেখানে ভেবেছেন- 'জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল।'[৭] অর্থাৎ, কবি নির্লিপ্ত হয়ে মৃত্যুর বৃহৎ পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে মনোহরময় সংসারকে অবলোকন করেছিলেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর সম্মুখে মৃত্যুকে অবলোকন করেছিলেন। যা তাঁকে গড়ে তুলেছিলো নির্বেদরূপে। অর্থাৎ, বলা যায় মৃত্যুভীতিকে তিনি দর্শনরূপে ধারণ করেছিলেন। এই মৃত্যুদর্শন থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীত রচনায় উচ্ছ্বাসহীন পরিমিতিবোধে কথা ও সুরের যুগল মিলন ঘটান। যার ফলে, রবীন্দ্রসংগীতের বাণী হয়ে ওঠে অনিবার্য, বাস্তব এবং বিকল্পহীন। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন- 'সব কিছু কালগ্রস্ত হলেও পরাস্ত হবে না তাঁর গান।'[৮] অর্থাৎ, রবীন্দ্রচিন্তার প্রতিটি পরতের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সংগীতে। সুতরাং, রবীন্দ্রসংগীতের বাণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা এবং মৃত্যুদর্শন পরিপূর্ণ উদ্‌ঘাটন সম্ভব।

পূজা পর্যায়ের গানে মৃত্যুভাবনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পূজা পর্যায়ের গানের বাণীতে ঈশ্বর ভক্তির নানান রূপ প্রকাশ করেছেন। পূজা পর্যায়ের বিভিন্ন উপ-পর্যায়ই প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর শুধুমাত্র বেদিতে অবস্থান করেন না বরং সর্বত্র ঈশ্বর বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে বরণ করেছেন- গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখ, আত্মবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ ও পরিণয়রূপে।[৯] রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে এমন আত্মিক বন্ধনে বাঁধতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ঈশ্বরের মূল নিদর্শন সৃষ্টি ও মৃত্যুকে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন জীবনের মতো মৃত্যুও এক পরম সত্য বার্তা। অখণ্ড গীতবিতানের প্রথম গানের বাণী-

কান্নাহাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা-
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা?[১০]

পূজা পর্যায়ের 'গান' উপ-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত গানটিতে রবীন্দ্রনাথ 'গানের ডালা' বলতে সমস্ত জীবনের কর্মকে বুঝিয়েছেন। অপরদিকে, 'পৌষ-ফাগুন' এবং 'কান্নাহাসি' শব্দ দ্বারা সৃষ্টি ও মৃত্যুর বার্তা দিয়েছেন। আমাদের এই জীবন-সীমার মাঝেই আমাদেরকে কর্মের ডালা সাজিয়ে যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গানে জীবনের পরিসীমা অর্থাৎ, সৃষ্টি ও মৃত্যুকে যেভাবে সহজভাবে প্রকাশ করেছেন, এই সহজতাই রবীন্দ্রসংগীতের বাণীর প্রতিটি উচ্চারণ বিকল্পহীন এবং অনিবার্য করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সে লেখা পূজা পর্যায়ের গান 'তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়' এই গানটির সঞ্চারী অংশের বাণী-

আমার নীরব বেলা সেই তোমারি সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠবে পুরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে,
যখন রাত্রি আঁধার হবে,
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে।[১২]

এই গানটিতে রবীন্দ্রনাথ বাণীর সাথে কোমল স্বর ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনের শেষ বেলার ব্যথা প্রকাশ করেছেন। ফুরানো দিনের বার্তার সাথে জীবনের কর্মগুলো 'তারা' হয়ে ফুটে উঠবে এমন প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রসংগীতের বাণীতে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটেছে কখনও 'সভাকর্তা' অথবা 'কবি' সম্বোধন করে। 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান'[১৩] গানটিতে কবি বলেছেন-

তোমার সভায় যবে করব অবসান
এই ক'দিনের শুধু এই ক'টি মোর তান ॥
তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে?[১৪]

গানটিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসভা হতে বিদায় অর্থাৎ, মৃত্যু বা জীবন অবসানকে স্বাভাবিক বলেছেন তবে ঈশ্বরের সাথে জীবনকালের যে সংযোগ তার স্মৃতি কি একেবারেই মুছে যাবে কি না সে জিজ্ঞাসা রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গানে মৃত্যুভাবনা আলো-আধাঁরীর মতো লুকোচুরি খেলেছে। মৃত্যুকে তিনি অনুধাবন করেছেন বিভিন্ন রূপে- কাছ থেকে দূরে, জানা থেকে অজানায়, ক্ষুদ্র থেকে বিশালতায়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু একটি অপরটির পরিপূরক, পর্যায় ক্রমিক অনন্তধারা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে জীবনকে একটি দিনের সাথে তুলনা করেছেন। একটি দিনের সূচনায় যেমন সূর্যের আলোয় যাত্রা আরম্ভ হয় তেমনি দিন ফুরাতেই অন্ধকারের তমসা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। ঠিক তেমনি আমাদের জীবনের 'সাঁঝ-বেলা'[১৫] বলতে কবি জীবন অবসানের ক্ষণকে বুঝিয়েছেন। জীবনকালে নানান কর্মযজ্ঞের খেলার মাঝেই যে জীবনের সাঁঝ বেলার সময় হয়ে যায় তার বার্তা রবীন্দ্রনাথের এই গানের মাঝে পাই-

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।
একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।[১৬]

অপর একটি পূজা পর্যায়ের গানে রবীন্দ্রনাথ জীবনের সময়সীমার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সময়সীমার ঊর্ধ্বে যে শুধুমাত্র ঈশ্বরের বিরাজ করেন এবং আমাদের জীবন যে সীমানায় বাঁধা সেটিও তাঁর গানে প্রকাশ পেয়েছে-

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে ॥
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই দু বাহু বাড়ায়ে ॥[১৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের বাণীতে মৃত্যু পরবর্তী অবস্থান অর্থাৎ, কর্ম দিয়ে কখনও জাগতে চেয়েছেন আবার কখনও মৃত্যু দিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য চেয়েছেন। যেমন- 'তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে।।'[১৮] এই গানে মরণ হতে গানের সুর অর্থাৎ, কর্ম দিয়ে জেগে উঠতে চেয়েছেন। আবার অপর আরেকটি গান- 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে'[১৯] গানটিতে জীবনকাল শেষে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

আলো-অন্ধকারের অভেদ ঘুচিয়ে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে প্রেয়সী রূপে কল্পনা করেছেন। এমন করে মৃত্যুর সুন্দর মূর্তির রূপ রবীন্দ্রনাথের 'বন্ধু'[১৯] উপ-পর্যায়ের গানে আমরা পাই-

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-পরে-
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।।[২০]

রবীন্দ্রনাথের 'প্রার্থনা'[২১] উপ-পর্যায়ের 'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে'[২২] গানটির শেষ লাইনে কবি বলেছেন- 'মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে, তুমি আমার আনন্দ।'[২৩] মানুষের জন্ম-মৃত্যুর এই অভিসার অনাদি কাল হতে চলছে। মৃত্যুই যে এই অভিসারের পূর্ণতা সেটির প্রকাশ করেছেন কবি এই গানে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসে মৃত্যু শুভ, কল্যাণ এবং আনন্দের প্রতীক। এই বিশ্বাসের কারণেই তাঁর গানের বাণীতে অনিত্যের সাথে নিজের খেলার আভাস রয়েছে। তিনি বলেছেন-

যত বাঁধন সব টুটে গো যেন
প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।।[২৪]

রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের 'বিরহ'[২৫] উপ-পর্যায়ের গানের বাণীতে মৃত্যুকে বিরহ রূপে প্রকাশ করেছেন নানানভাবে। হাসি-কান্নার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত জীবনের সমাপ্তি ঘটে। এই অপেক্ষা একান্তই নিজের। এই শেষ জীবনের পরপারে আমরা শুধুমাত্র ঈশ্বরকেই ভরসা করতে পারি। সেই প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন-

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে ॥
ভেঙে এলেম খেলার বাঁশি, চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি,
সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে ॥[২৬]

রবীন্দ্রনাথ 'মৃত্যু' শব্দের ব্যবহার তাঁর 'বিরহ'[২৭] উপ-পর্যায়ের গানে নানাভাবে এনেছেন। যেমন- 'এখনো মরণব্রত জীবনে হল না সাধা'[২৮], 'আমি আপন মনের মাঝেই মরি'[২৯], 'তোমার রাতে মিলাক আমার জীবনসাঁঝের রশ্মিরেখা'[৩০] এই গানের বাণীতে মৃত্যুচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জগৎ রচনাকে কাব্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং মৃত্যুকে সেই কাব্যের প্রধান রস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- 'জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় পাই।'[৩১]

'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তার প্রকাশ তাঁর 'গীতবিতানের' 'দুঃখ' উপ-পর্যায়ের গানের বাণীতে একইভাবে আমরা পাই-

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক
তবে তাই হোক।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক।[৩২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পথ'[৩৩] উপ-পর্যায়ের গানের বাণীতে জীবনকে খেয়াপারের সাথে তুলনা করেছেন। যার এক কূলে জন্ম এবং অপর প্রান্তে মৃত্যু। তিনি বলেছেন- 'এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে আমার বাড়ি/কেউ বা আসে এ পারে, কেউ পারের ঘাটে দেয় রে পারি ॥'[৩৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্মুখে ঘটে যাওয়া 'মৃত্যু'কে সাধন করেছেন। মৃত্যু তাঁর আপনজনকে দূরে নিয়েছে ঠিকই; সেই মৃত্যুব্যথাই আবার কবির আপনজনকে নিকটে ফিরিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষ'[৩৫] উপ-পর্যায়ের গানের বাণীতে বলেছেন- 'আজ মরণ-বীণার অজানা সুর নেব সেধে'[৩৬] আবার কখনও বলেছেন-

মরণের মুখে রেখে দূরে যাও দূরে যাও চলে
আবার ব্যথার টানে নিকটে ফিরাব ব'লে।।[৩৭]

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রেক্ষিতে কবি তাঁর গানের বাণীর মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে বর্ণনা করেছেন-

পুষ্প দিয়ে মারো যারে চিনল না সে মরণকে।
বান খেয়ে যেপড়ে সে যে ধরে তোমার চরণকে।।
সবার নীচে ধুলার' পরে ফেলো যারে মৃত্যুশরে
সে যে তোমার কোলে পড়ে, ভয় কি বা তার পড়নকে?[৩৮]

স্বদেশ পর্যায়ের গানে মৃত্যুভাবনা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশ' পর্যায়ের গানের বাণীতে 'মৃত্যু'কে জীবনের বিকাশ, উন্মেষ ও পরিণতি রূপে প্রকাশ করেছেন। তিনি এই পর্যায়ের গানের বাণীতে মৃত্যুকে জয় করে জীবনের উত্তরণ সাধন এবং তাকেই প্রেরণা রূপে ধারণ করেছেন। যেমন- 'আমি ভয় করব না'[৩৯] গানটিতে কবি আমাদের নিত্য দিনের জীবনে মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে, মৃত্যুকে জয় করে মাথা তুলে তার মোকাবেলা করতে বলেছেন।

আবার দেশমাতৃকার প্রেমে নিজেকে নিবেদন করে, এর কর্ণধারের প্রতি একাত্মতা প্রকাশের মাধ্যমে স্বদেশের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে কবির গানে প্রকাশ পেয়েছে যে বাণী-

আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল,
তুমি এখন ধরো গো হাল
ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন,
ভাবনা কী বা তার
তোমারে করি নমস্কার।[৪০]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গানে বিঘ্নবিপদ, দুঃখদহন তুচ্ছ করে, মৃত্যুগহন পার করে মোহমুক্ত হয়ে যে সকল বীর স্বদেশের জন্যে আত্মনিবেদন করেছেন, কবি তাঁদের জয়গান গেয়েছেন। কালক্ষেপণ না করে সকলকে জাগ্রতও হতে বলেছেন তাঁর গানের বাণীতে-

আজ নিতেও হবে, দিতেও হবে, দেরি কেন করিস তবে-
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে; মরতে হয় তো মর্ গো ॥[৪১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশের গানে মৃত্যুতোরণকে অতিক্রম করতে জড়তা ও ক্লান্তিজালকে ছিন্ন করে 'মৃত্যুতরণ তীর্থে'[৪২] স্নান করতে বলেছেন। দুঃখবোধ যে মহান প্রেরণারূপে শক্তি জোগায়, কবি সেই চেতনা তাঁর স্বদেশের গানের বাণীতে প্রকাশ করেছেন।

প্রেম পর্যায়ের গানে দুঃখবোধ

রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গানে নানান রূপকে দুঃখবোধের সন্ধান মেলে। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম নিবেদন করেছেন, ঠিক সেই প্রেমই তিনি মরণের প্রতি নিবেদন করতে চেয়েছেন। অন্তিম মুহূর্তের প্রেম যে অসীম এবং অনন্তকালের সেই প্রকাশ কবি তাঁর গানের বাণীতে করেছেন। কবি বলেছেন- 'মিলন-ছোঁওয়া বিচ্ছেদেরই অন্তবিহীন ফেরাফেরি, কাটিয়ে দিয়ে যাও গো নিয়ে আনাগোনার পারে।'[৪৩] আবার 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' গানটিতে তিনি প্রেয়সীকে 'জীবন মরণ বিহারী'[৪৫] বলে সম্বোধন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান'[৪৬] প্রেম পর্যায়ের গানটিতে মৃত্যুকে মধুর করে প্রিয়জনের চরণে নিজের প্রাণ সঁপে দেবার বাসনা করেছেন। অপর একটি পূজা পর্যায়ের গানের বাণীতে কবি দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে প্রেমের নিশান উড়াতে চেয়েছেন। কবি বলেছেন- 'পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি, মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ আমি আছি।'[৪৭] রবীন্দ্রনাথ প্রেম পর্যায়ের গানগুলিতে দুঃখবোধকে অতিক্রম করে নিগূঢ় প্রেমবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

ঈশ্বরবন্দনার গানের বাণীতে মৃত্যু শোকের ছায়া

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে বহু মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। আপনজনকে তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে আরও কাছে টেনেছেন। মৃত্যুকে আহ্বান করেছেন বন্ধু রূপে এবং আলিঙ্গন করেছেন এর তীব্র বেদনাকে। তিনি মৃত্যুর বেদনা উপলব্ধির বয়সের পূর্বেই হারাতে শুরু করেছিলেন তাঁর

আপনজনকে। পরবর্তী সময়ে সেটি উপলব্ধ হলে সেই মৃত্যুকষ্টগুলি হয়ে ওঠে স্থায়ী। জীবনস্মৃতিতে তিনি বলেছেন- 'যাহা নাই তাহাই মিথ্যা; যাহা মিথ্যা তাহা নাই'[৪৮] তবে কবিমনের এক জায়গায় আত্মতুষ্টি যে, এই খেলা চিরকালের নয়। তাই তিনি বলেছেন– 'আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে গাঁথা দেওয়ালের মধ্যে চিরকাল কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম।'[৪৯]

মৃত্যুশোকের প্রতিকারহীন আঘাত ব্যক্তিহৃদয়ে যে অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করে, তার ব্যক্তিগত কষ্টটুকু রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবেই অবগত করতে পেরেছিলেন। 'শেষ সপ্তকের' আঠারো সংখ্যক কবিতায় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে উদ্দেশ্য করে আসলে তিনি নিজ হৃদয়েরই বিশ্লেষণ করেছেন-

সকল অহংকারই বন্ধন,
কঠিন বন্ধন আপন শোকের অহংকার।
ধনজন মান সকল আসক্তিতেই মোহ,
নিবিড় মোহ আপন শোকের আসক্তিতে।[৫০]

এই আসক্তির মোহ হতে নিজের আত্মাকে মুক্ত রাখাই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনার মূল কথা। কবিজননী সারদা দেবীর দেহান্তর রবীন্দ্রনাথের প্রথম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা। কিশোর বয়সে মাতৃবিয়োগের স্মৃতিটুকু তিনি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন। সেসময় জীবন হতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্টভাবে তাঁর মনে জাগেনি। কিন্তু জননীর স্মৃতি যে তাঁর চেতনায় মাতৃত্বের অনুষঙ্গে প্রত্যক্ষ ছিল তার প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানেও মাতৃমূর্তি কল্পনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে মাতৃশোকের অব্যক্ত বেদনার মাঝেই তিনি পত্নী ও পুত্র শমীর মৃত্যুতে অনন্ত বেদনার জালে আটকা পড়েন। ঈশ্বরের এই দেয়া বেদনাটুকুও তিনি বৃথা যেতে দেননি। জীবনের সকল পাওয়ার মাঝে বেদনাও যে অন্তর্ভুক্ত সেটি মেনেই পথ চলেছেন। 'শিশু' কাব্যের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন 'কবিতাগুলি যখন লিখেছিলাম তখন শমী ও তার মায়ের জীবনটাই আমার সামনে ছিল। মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল।'[৫১]

রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় প্রেরণা কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর গভীর বেদনায় গম্ভীর হয়ে উঠেছিল কবির বাণী ও সুর। ১২৯২ বঙ্গাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'দীর্ঘ জীবনপথ; কত দুঃখ তাপ' গানটি প্রকাশ করেছিলেন। কাদম্বরী দেবীর ইহলোক ত্যাগের প্রায় তিন বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন-

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।[৫২]

কিন্তু 'ভারতী' তে প্রকাশিত এই উৎসর্গ করা কবিতাটির প্রথম আট পঙ্‌ক্তি ব্রহ্মসংগীত রূপে ১২৮৭ সালের মাঘোৎসবে গীত হয়।[৫৩] মানবী কাদম্বরীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত গান অনায়াসে দেবতার উদ্দেশ্যে গীতনিবেদনে পরিণতি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধ্রুবতারা' স্বরূপ নারীকে আবেগের এক

দুর্লভ আসনে স্থান দিয়েছিলেন। সেটি সহজেই অনুধাবন করা যায়। তাঁকে হারাবার বেদনাও যে কত গভীরতর হতে পারে সে কথা সহজেই অনুমেয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোককে তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে ধারণ করেছেন। ঈশ্বরের এই বেদনা দানটুকুও তিনি বৃথা যেতে দেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একান্ত পারিবারিক সম্পর্কের বাইরেও কিছু-কিছু মৃত্যু বিচ্ছেদের আঘাতে গান রচনা করেছেন। গীতবিতানের 'পূজা' পর্যায়ের সন্নিবেশিত মৃত্যুভাবনা নিয়ে রচিত গানে শূন্যতাবোধের স্থান নেই বরং রয়েছে জ্যোতির্ময় অস্তিত্বের অনুভব। মৃত্যুঘটনার স্মৃতিতে রচিত হলেও এটি মৃত্যুবেদনার গান নয়, অমৃত চেতনারই জয়গান হিসেবে রচনা করেছেন সে সকল গান।

গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলির গানের মধ্যে কবির ঈশ্বরভাবনার এক নবরূপ প্রকাশিত হয়েছে। গানগুলি পূর্বের গানের থেকে অনেকাংশেই স্বতন্ত্র। *গীতাঞ্জলি* প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কাব্যটিতে গীতিকবিতার সংখ্যা ১৫৭। এর মাঝে ৮৫টি সুর দেওয়া হয়েছে এবং বাকিগুলি গান আকারে থাকলেও সুরবদ্ধ গান নয়।[৫৪]

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের পূজা পর্যায়ের গানগুলি ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজনে রচিত হয়েছিল, এজন্য এখানে রবীন্দ্রনাথের নিজ ভাবনার প্রকাশ সে অর্থে ঘটেনি। তবে প্রয়োজনের তাগিদে হলেও কবির কবিসত্তার প্রকাশ রুদ্ধ থাকেনি। ঈশ্বরের সাথে মানবমনের সংযোগ তখনও তিনি ঘটিয়েছেন। যেমন: 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে'[৫৫] গানটি তার প্রমাণ। এই গানের মধ্য দিয়ে কবি ঈশ্বরকে কাছে পাওয়ার আকুলতা প্রকাশ করেছেন।

তবে *গীতাঞ্জলি* রচনার মধ্য দিয়ে কবি প্রতিভার সাথে সাথে ঈশ্বরপ্রেমের ও ঈশ্বরভাবনার এক যুগল মিলন ঘটেছে। যেটির কারণে এটি কবির অনন্য রচনা হিসেবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের পূজার গানে পূর্বে ঈশ্বর ছিলেন জ্ঞানসাধ্য *গীতাঞ্জলিতে* পরে ঈশ্বর ধরা দিলেন প্রেমের বন্ধনে। কবি এখানে মানব, প্রেম, প্রকৃতি ও ঈশ্বরকে বাঁধলেন এক সূত্রে।

ব্রহ্মসংগীত পরিবেশনে বা পাঠে ব্রাহ্মসমাজের একটি তাগিদ কাজ করে এবং এটির সম্পর্কে ধারণার প্রয়োজন। অপরদিকে *গীতাঞ্জলিতে* ঈশ্বরভাবনা অতি সহজ। যেখানে অন্য জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। শ্রোতা বা পাঠক সহজেই এই গ্রন্থের মর্মে পৌঁছাতে পারেন। আঁদ্রে জিদ বলেছিলেন- "What I admire Gitanjali is that one does not need any preparation to read it"[৫৬] *গীতাঞ্জলিতে* কবির যে মরমি ভাব প্রকাশিত সেটির কারণে ছন্দ বা অনুপ্রাস এ সকল বিষয় সে অর্থে শক্তিশালী নয়। কারণ ভাষান্তরিত হয়ে গ্রন্থটির ছন্দ এবং সকল নিয়ম অনেকভাবেই পরিবর্তিত হয়েছে। তবুও এই গ্রন্থ বাংলায় যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনিভাবে অন্য ভাষার পাঠকগণ গ্রন্থটি গ্রহণ করেছেন *গীতাঞ্জলিতে* রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনার সাথে সুফি এবং বাউল মতের অনেক মিল রয়েছে। যেমন:

আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণেক্ষণে তাহার পায়ের ধ্বনিখানি।[৫৭]

সুফি মতে, ঈশ্বর সাধনা ঈশ্বর প্রদত্ত। ঈশ্বরের জন্য আকুলতাটিও ঈশ্বরের দান। Mystic সাধকগণ যেমন এক বিশেষ শক্তির উপলব্ধি করেন তেমনিই এই অধরা উপলব্ধিতে তিনি ব্যাকুল হয়ে যান। রবীন্দ্রনাথের গানে সেই ব্যাকুলতাটি স্পষ্ট।

গীতাঞ্জলি রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ অনেক মৃত্যুশোক পেয়েছেন। ফলে এই কাব্যগ্রন্থে কবির মনে নিঃসঙ্গতায় বসে অধরার স্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। বাউল গানে যেমন রয়েছে- 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' তেমনি রবীন্দ্রসংগীতে রয়েছে-

বিশ্ব যখন নিদ্র মগন; গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝংকার।[৫৮]

ক্ষণিকের আসা-যাওয়া এবং ক্ষণে ক্ষণে হঠাৎ বীণার তারে ঝংকার বিরহবোধকে জাগিয়ে তোলে প্রতিনিয়ত। বিরহের অতি সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে *গীতাঞ্জলির* 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' গানটিতে। গানটি *গীতবিতানের* প্রকৃতি পর্যায়ের বর্ষার গান বলে নির্দিষ্ট হলেও *গীতাঞ্জলির* অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঈশ্বর ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে অনেকভাবে। যেমন সঞ্চারিতে-

তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদলবেলা।[৫৯]

শুধুমাত্র ক্ষণিকের জন্য নয়, এই ব্যাকুল প্রতীক্ষা সমস্ত জীবনের। যেখানে 'একা দ্বারের পাশে' আমরা রয়ে যাই এবং প্রতিনিয়ত মেঘ কাটার প্রত্যাশায় আমাদের দিন কাটে।

ঈশ্বরকে কাছে পাওয়ার প্রথম শর্তই বিঘ্ন অহংকার ত্যাগ করা। *গীতাঞ্জলির* প্রথম গানটিই অহংকার মার্জনের গান-

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।[৬০]

ধর্ম সাধনায় অহংবিনাশের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথের যাত্রা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ধামি'কে লোপ করেননি বরং মার্জনা করার প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেছেন-'তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।'

বিশ্বজগতের শক্তিরূপে যে ঈশ্বর বিরাজমান রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সেটি প্রকাশ করেছেন। এই বোধ তাঁর আধ্যাত্মিকতাকে এক অভিনব রূপ ও গতি দিয়েছে। বিশ্বের সাথে যোগই যে ঈশ্বরের সাথে যোগ সেটি গানে গানে প্রকাশ পেয়েছে-

বিশ্ব সাথে যোগে যেথাই বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও ॥
নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারো।[৬১]

যখন একবার মনের দৃষ্টি খুলে যায় তখন বিশ্বের ধূলিকণার মাঝেও ঈশ্বরের স্পর্শ অনুভব করা সম্ভব। ঈশ্বরের সাথে যোগ হবার যে প্রতীক্ষা সেটিও *গীতাঞ্জলির* গানে প্রকাশিত-

বাতাস বহে মরি মরি আর বেঁধে রেখো না তরী
এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয় মাঝারে[৬২]

ঈশ্বরের সাথে মিলনের তরী কবে ভিড়বে এই প্রতীক্ষায় কবির মনের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। মানবপ্রেমের চেয়ে ঈশ্বরপ্রেমের টান আরো গভীর ও প্রবল। ঈশ্বর কখনও তাঁর প্রেমিককে মুক্তি দেন না তাই বাইরের জগতের সাথে সাথে আপন মনের নির্জনতায় ঈশ্বরকে খুঁজে ফিরতে হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাইনি।
তোমায় দেখতে আমি পাইনি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাইনি।[৬৩]

গীতিমাল্য

রবীন্দ্রনাথের *গীতিমাল্যে* ঈশ্বরের সাথে মানব প্রেমের স্বচ্ছতা ফুটে উঠেছে। এই প্রেমের লঘু-গুরু ভেদ নাই। তাই ঈশ্বরকে নেমে এসে দাঁড়াতে হয় মানবের দুয়ারে। মানবের সাথে ঈশ্বরের সহজ সম্পর্কের ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর গানের বাণীতে-

অসীম ধন তো আছে তোমার, তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে কণায় কণায় বেঁটে।।
...আমায় তুমি করবে দাতা, আপনি ভিক্ষু হবে[৬৪]

সুফিবাদে ঈশ্বরের সাথে সাধকদের যেমনি সহজ এক সম্পর্ক তেমনি কবিও সকল আড়ম্বর ত্যাগ করে নিজেকে সঁপেছেন ঈশ্বরের কাছে। এ জন্য রচনা করেছেন 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।'[৬৫]

গীতালি

রবীন্দ্রনাথের *গীতালিতে* দুঃখসাধনার গানই অধিকাংশ জুড়ে আছে। তাতে প্রতীক্ষার গানও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃখসাধনার বিষয়টি নেতিবাচক নয় কারণ ঈশ্বরের একাংশ সুখ অপরাংশ দুঃখ। এই দুটি মিলেই আনন্দময় স্বরূপ, কারণ ভাঙা-গড়ার মাঝেই আমাদের জীবন। মৃত্যু, দুঃখ, ভয় এই সকলের শেষে সুখের সন্ধান মেলে। সুতরাং, তিনি দুঃখবোধের প্রকাশ করলেও হতাশা সেখানে স্থান পায়নি বরং ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অটুট বিশ্বাস লক্ষ করা যায়-

কাঁদন দিয়ে সাধন আমার চির দিনের তরে গো,
চিরজীবন ধরে।[৬৬]

নৈবেদ্য

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্য রচনার মাঝে *নৈবেদ্য* একটি অভিনব সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ সর্ব সংস্কারমুক্ত সত্য ধর্মের বার্তা দিয়েছেন এই গ্রন্থে। পূর্বে তিনি বিশ্ব ও মানবপ্রেমের অনেক কাব্য রচনা করেন,

তবে 'ব্রহ্মসংগীত' এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা ও তপস্যা রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধকে করেছে পরিপক্ক। এই বোধ থেকেই তিনি নৈবেদ্য রচনা করেছেন। সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ ও সত্য পথে চলার বাসনা কবিতাগুলির মাঝে প্রকাশ পেয়েছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হলো স্বদেশসাধনা। সংস্কারমুক্ত ধর্মসাধনা *নৈবেদ্যতে* প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের *নৈবেদ্য* কাব্যগ্রন্থটি থেকে কিছু কবিতা পূজা পর্যায়ের গানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন-

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।[৬৭]

গানটি পূজা পর্যায়ের 'শেষ' উপপর্যায়ে স্থান পেয়েছে। প্রতিনিয়ত আমাদের যে জীবন প্রক্রিয়া তার মাঝে কোথাও ফাঁক নেই। বিভিন্ন রূপে আমাদের জীবন প্রক্রিয়া চলমান। মৃত্যু মানেই শেষ নয় বরং এটি জীবন প্রক্রিয়ার একটি রূপ। রবীন্দ্রনাথের বাণীতে আমরা পাই- 'মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ।"[৬৮]

সৃষ্টির সকল কিছু আমাদের নিকটে আছে তা আমাদের জন্য সৃষ্টি তবুও আমাদের আকুলতা প্রতিনিয়ত নিজের আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটি পাবার জন্য।

কলুষমুক্ত মন নিয়ে না চললে সেই মনই আমাদের মাঝে বোঝা হয়ে যায়। নিজের মাঝে যদি আমরা সত্য ও সুন্দরের পথের ঠিকানা পাই তবেই মসৃণ হবে আমাদের চলার পথ। *নৈবেদ্য* কাব্যগ্রন্থ থেকে পূজা পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত আরেকটি গান-

সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো, হে নাথ, প্রণামি তোমায় গাহি বসে তব গান।[৬৯]

পৃথিবীর সকল কিছু সাজানো থাকে মানবজীবন অতিবাহিত করার জন্য। তবে এ সকল আয়োজন যখন ফিকে হয়ে যায় মানবমন ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই নিবেদন আয়োজনবিহীন হলেও ঈশ্বরের কৃপার আশায় আমরা চিরকাল অপেক্ষা করতে থাকি। রবীন্দ্রনাথের এই ঈশ্বরবোধ ও দুঃখবোধের চিন্তায় বেদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি জীবনকে দুঃখময় বলেননি, বলেছেন যে, দুঃখের উৎস জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন গানের বাণীতে এই প্রেক্ষাপটটিই জাগিয়ে তুলেছেন।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতে মৃত্যুচিন্তার প্রতিফলন অনুধাবনের প্রধান মাধ্যম হলো, তাঁর গানের বাণী বিশ্লেষণ করা। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা স্পষ্ট হই যে, রবীন্দ্রনাথ দুঃখ শোকে মগ্ন হননি আবার একে অস্বীকারও করেননি বরং তিনি তা অতিক্রম করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্মুখে বহু আপন জনের ছন্দপতন হতে দেখেছেন, তবে এই মৃত্যুকে তিনি তাঁর কবিতা ও গানে অর্চনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো আর কোনো কবি-সাহিত্যিক মৃত্যুর রূপ নিয়ে এতো অভিভূত হননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের বাণীতে বহুবার প্রকাশ করেছেন যে, মৃত্যু জীবনের সমাপ্তি নয় বরং বেশবদল মাত্র। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা ও দর্শন বিশ্লেষণ করলে আমরা ভয়শূন্য এক সত্যের সাথে পরিচিত হই। রবীন্দ্রনাথের গানের এক বিশাল জায়গা জুড়ে তাঁর এই

দর্শনবোধ বর্ণিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করে পাঠ ও পরিবেশন করলে সেটি আরও সার্থক হবে বলে আশা করি।

তথ্যনির্দেশ

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি* (কলকাতা : বিশ্বভারতী ১৪২১), পৃ. ১৫২
২ তদেব, পৃ. ১৫৩
৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ ১৪২৪), পৃ. ২৩৩
৪ সুধীর দত্ত, *মুদ্রা* নবপর্যায় চতুর্থ বর্ষ, শৈবাল সরকার সম্পা., (নদিয়া : মুদ্রা প্রকাশনা ২০২১), পৃ. ৯৩
৫ হায়াৎ মামুদ, *মৃত্যুচিন্তা রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জটিলতা* (ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ ১৯৬৮)
৬ ড. দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার, *রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন* (কলকাতা : সাহিত্যলোক ১৯৮৭)।
৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪
৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ ১৩৫৪), পৃ. ৪২৪
৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
১০ তদেব, পৃ. ৫
১১ তদেব, পৃ. ৬
১২ তদেব, পৃ. ৬
১৩ তদেব, পৃ. ৮
১৪ তদেব, পৃ. ৩৪
১৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০
১৬ তদেব, পৃ. ১০
১৭ তদেব, পৃ. ১০
১৮ তদেব, পৃ. ১২
১৯ তদেব, পৃ. ৭
২০ তদেব, পৃ. ৪৩
২১ তদেব, পৃ. ৭
২২ তদেব, পৃ. ৪১
২৩ তদেব, পৃ.
২৪ তদেব, পৃ. ৪৮
২৫ তদেব, পৃ. ৭
২৬ তদেব, পৃ. ৬৮
২৮ তদেব, পৃ. ৭০
২৯ তদেব, পৃ. ৭৪
৩০ তদেব, পৃ. ৭৩
৩১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মপরিচয়* (কলকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৫০), পৃ. ২২৪
৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭
৩৩ তদেব, পৃ. ৭

৩৪ তদেব, পৃ. ২২১
৩৫ তদেব, পৃ. ৭
৩৬ তদেব, পৃ. ২৩০
৩৭ তদেব, পৃ. ২৩১
৩৮ তদেব, পৃ. ২৩২
৩৯ তদেব, পৃ. ২৪৬
৪০ তদেব, পৃ. ২৪৯
৪১ তদেব, পৃ. ২৬০
৪২ তদেব, পৃ. ২৬৪
৪৩ তদেব, পৃ. ২৭৯
৪৪ তদেব, পৃ. ২৮৫
৪৫ তদেব, পৃ. ২৮৫
৪৬ তদেব, পৃ. ২৮৮
৪৭ তদেব, পৃ. ২৯১
৪৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩
৪৯ তদেব, পৃ. ১৫৪
৫০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ ১৪১০), পৃ. ৩১৫
৫১ জয়ন্তী ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান* (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী ১৩৯২), পৃ. ১৫৪
৫২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮
৫৩ জয়ন্তী ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮
৫৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪
৫৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫
৫৬ প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *গীতবিতানের আরশীনগর* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং ২০১১) পৃ. ৩৬
৫৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮
৫৮ তদেব, পৃ. ৫৯৫
৫৯ তদেব, পৃ. ৩০৮
৬০ তদেব, পৃ. ১৩৬
৬১ তদেব, পৃ. ১৩৮
৬২ তদেব, পৃ. ৩০২
৬৩ তদেব, পৃ. ১২০
৬৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতলেখা* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ ১৪১০), পৃ. ৪১৮
৬৫ তদেব, পৃ. ৪৫০
৬৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭
৬৭ তদেব, পৃ. ৪২১
৬৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১০
৬৯ তদেব, পৃ. ৫০২

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৪, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২৪

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সংকট : ইসলামের সমাধান

ড. মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন*

Abstract

Cultural globalization has turned healthy, strong, functional and personable people into sick, weak, material and shameless people. Breaking thousands of families, dreams and the goal of becoming an ideal person. Illegitimate relationships, illegitimate children, adultery, homosexuality and promiscuity have increased. The main objective of this research paper is to bring all these people back to the path of light, the path of healthy culture and the path of their own cultural history and traditions and make them into people with personality and become valuable resources for the family, society, country and nation. Analysis and review method is mainly followed in writing the article. The research work highlights the harmful aspects of globalization. The difference between cultural globalization and Islamic culture is clarified. Besides, effective recommendations are presented to protect against globalization. The proposal will play an effective role in the formation of the country and nation.

চাবিশব্দ: সংস্কৃতি, বিশ্বায়ন, সংকট, সমাধান, প্রস্তাবনা

ভূমিকা

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে কার্যকর আগ্রাসনের নাম। যার দ্বারা মানুষের মস্তিষ্কের কার্যকারিতাকে অক্ষম করে আধুনিক দাসে পরিণত করা হচ্ছে। ইন্টারনেট, তথ্যপ্রযুক্তি, স্যাটেলাইট, খেলাধুলা ও আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পুরে আগ্রাসনবাদী রাষ্ট্রগুলো নিজেদের ইচ্ছেমতো সুইচ টিপে বিশ্বকে নাচাচ্ছে। যার ফলে বিশ্ব উপহার দিচ্ছে এক দল অলস, অকর্মণ্য, চরিত্রহীন ও মূল্যহীন মানুষ। যাদের দুনিয়া, আখিরাত, পরিবার, সমাজ, ধর্ম, সুস্থসংস্কৃতিসহ কোনো বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও অবদান নেই। এ সকল অকর্মণ্য মানুষগুলোকে কর্মঠ ও চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলতে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে নিজেদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যর দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য এ গবেষণাটি যুক্তিযুক্ত। নাজির আহমদ ও রুহুল আমিনের *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস ১৯৮৯*, আব্দুর রহিম রচিত *শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি ২০০০*, মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদারের *আমাদের সংস্কৃতি ঃ বিচার ও চ্যালেঞ্জ সমূহ ২০০১*, ড. এমাজ উদ্দিন রচিত *সমাজ, সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন ২০১৫*, ড. আহমাদ আইয়ূব সুলাইমানের *সংস্কৃতির বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ ২০০৯* সহ সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন সংক্রান্ত অসংখ্য প্রবন্ধ ও বই রচিত হয়েছে। তবে এসকল গবেষণাগুলোতে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের হাত থেকে চিরমুক্তির জন্য ইসলামের দৃষ্টিকোণ হতে কার্যকর প্রদক্ষেপ বর্ণনা করা হয়নি। তাই

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

'সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সংকট : ইসলামের সমাধান' প্রবন্ধটিতে কার্যকর প্রস্তাবনাসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

'সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সংকট : ইসলামের সমাধান' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে প্রধানত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হলো লিখিত বা মুদ্রিত বিভিন্ন উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সর্বস্তর জানা। উৎসগত শ্রেণিবিন্যাস মূলত দুই ধরনের। এর একটি হচ্ছে প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত; যা সরাসরি কুরআন ও হাদিস থেকে নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সহায়ক উপকরণ- প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট বই, প্রবন্ধ, টেলিভিশন, নিউজ, পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন, টকশো ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ও ইসলামি সংস্কৃতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাসমূহ। যার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বিস্তর গবেষণার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের ক্ষতিকর দিকসমূহ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রভাব ও আসল টার্গেট আলোচনা করে এ থেকে মুক্তির কার্যকর প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, উক্ত গবেষণা কর্মটি মানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে অনবদ্য ভূমিকা পালন করবে।

সংস্কৃতির পরিচয়

'সংস্কৃতি' শব্দটি 'সংস্করণ' বা 'সংস্কার' বিশেষ্য পদ থেকে গঠিত। 'সংস্করণ' অর্থ বিশোধন, সংশোধন এবং সংস্কার অর্থ শুদ্ধিকরণ। শাস্ত্রীয় নীতিমালা ও অনুষ্ঠানাদি দ্বারা পবিত্রকরণ, শোধনকরণ বা পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারকরণ, পরিষ্কার বা নির্মলকরণ, অলঙ্করণ, প্রসাধন, উৎকর্ষ সাধন, উন্নতি বিধান, মেরামতকরণ ইত্যাদি।[১]

সংস্কৃতি শব্দের অর্থ হচ্ছে শিক্ষা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, শিল্পকলা, রুচি, তামাদ্দুন, মার্জনা, শিষ্টতা, সংস্কার, বিশোধন, সংশোধন এবং শুদ্ধিকরণ। অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, রীতি-নীতি ও মার্জিত আচার-আচরণ ইত্যাদির উৎকর্ষই সংস্কৃতি (Culture)। এ জন্য কৃষ্টিও সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানবসমাজের মানসিক বিকাশের অবস্থা, কোনো জাতির মানসিক ঔদার্যের মাপকাঠি, কোনো জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক শিক্ষা-সাহিত্য, বিশ্বাস-সমাজনীতি ইত্যাদির নাম সংস্কৃতি।

ইংরেজিতে Culture (কালচার) অর্থ কর্ষণ করা। অমসৃণ জমিকে যেমন কর্ষণ করে মসৃণ ও ফসল উৎপাদনের উপযোগী করা হয়; তেমনি সদাচরণ অনুশীলন দ্বারা একজন ব্যক্তি বা জাতি পরিশীলিত ও সংস্কৃতিবান হয়। এজন্য চাষকৃত জমিকে Cultured Land বলা হয়। তেমনি পরিশীলত ব্যক্তি বা জাতিকে বলা হয় Cultured man or Cultured nation.[২]

আরবিতে সংস্কৃতির প্রতিশব্দ হচ্ছে 'সাকাফাহ' (bill)। এর অর্থ সফল হওয়া, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ পাওয়া। মার্জিত, আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত মানুষকে 'মুসাক্কাফ' (ii) বা সংস্কৃতিবান বলে। আরবি 'তাহযীব' (...jri) এবং উর্দূ 'তামাদ্দুন' (১৬) শব্দ দুটিও একত্রে সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সভ্য-ভদ্র, সজ্জিত ও নন্দিত জীবনকে তাহযিব-তমদ্দুন বা সংস্কৃতি বলা হয়।[৩]

আরেক সংগায়

Culture is the complex whole which includes knowledge, belief, law, morals, law, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.[৪]

অর্থাৎ সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত জ্ঞান-বিশ্বাস, কলা, নীতি-নিয়ম, আইন, প্রথা, সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতার জটিল সমাবেশকে সংস্কৃতি বলা হয়।

মারিক বিন নবী সংস্কৃতির সংজ্ঞায় লেখেন, সংস্কৃতি কিছু বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ের নাম। বাহ্যিক বিষয়, যেমন নড়াচড়া, স্থির, ধরন ও কথাবার্তা, আর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে, যেমন স্বাদ, আস্বাদন, অনুভুতি, রসম-রেওয়াজ, প্রথা-প্রচলন ইত্যাদি অর্থাৎ কালচার এমন এক পরিবেশের নাম, যা একটি সমাজের ওপর বিশেষ জীবনের এমন এক ছাপ ফেলে যায় যা আমরা অন্য কোনো জাতি ও সমাজে দেখতে পাই না।[৫]

ইউনেস্কোর ১৯৮২ সালে মেক্সিকো সম্মেলনে সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে ঘোষণা করা হয়: ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্তা এবং কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত একমাত্র বিষয় নয়। মানুষের জীবনধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়।[৬]

ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক

ধর্ম ও সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক, কেননা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানব আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) কে পাঠানোই হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِي بُدًى فَمَنْ تَبِعَ بُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَوَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بتنا أو لدي استحب الناريم با ظنون

> অর্থ : আমি বললাম তোমরা সবাই জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আর যারা কুফরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।[৭]

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যেহেতু পৃথিবীতে সংস্কৃতির পূর্বে ধর্মের আগমন ঘটেছে সেহেতু ধর্ম থেকেই সংস্কৃতির উৎপত্তি। আরও সহজভাবে বলা যায় যে, ধর্মই সংস্কৃতির মা। সুতরাং মা ও সন্তানের মাঝে যেমন সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন, প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম ও সংস্কৃতির মাঝেও তেমন সম্পর্ক বিদ্যমান। পৃথিবীতে ধর্মের পরিবর্তন ও ভিন্নতার সাথে সাথে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। একটি ধর্মের সংস্কৃতির সাথে অপর ধর্মের সংস্কৃতির তেমন কোনো মিল নেই। প্রতিটি সংস্কৃতি অপর সংস্কৃতি হতে পৃথক ও ভিন্ন। প্রতিটি কৃষ্টির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। এজন্য স্বাভাবিকভাবে সে সমস্ত সভ্যতা ও কৃষ্টির অনুসারীরাও বিভিন্ন পথের পথিক, এমন কি রাস্তার

ভিন্নতার সাথে সাথে তাদের গন্তব্যও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু এই মতানৈক্যের বুনিয়াদ সে সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা নয় বরং এর বুনিয়াদ তাদের ধর্ম ও দীনের ভিন্নতা, যে ধর্ম ও দীন হতে এই সমস্ত তাহযিব ও কৃষ্টি বের হয়েছে এবং পৃথক পৃথক সৃষ্টি হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করেছে। একটি জাতি যদি দীন ও ধর্মের ক্ষেত্রে এক হয় তাহলে তার সভ্যতা-সংস্কৃতিও সাধারণত একই হয়। কিন্তু যদি একই অঞ্চলের বাসিন্দা আলাদা আলাদা ধর্মের অনুসারী হয়, তাহলে তাদের মাঝে সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিন্নতা হওয়াও অনিবার্য। ইতিহাস যখন থেকে বিভিন্ন ধর্মকে স্বীয় পাতায় সংরক্ষণ করেছে তখন থেকেই বিভিন্ন সভ্যতাও ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। যতদিন পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন পর্যন্ত বিভিন্ন সভ্যতাও এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং যেমনিভাবে অতীতেও ধর্মের বিভিন্নতার অস্তিত্ব ও সভ্যতার বিভিন্নতার বুনিয়াদ ছিল, তেমনিভাবে ভবিষ্যতেও এই বুনিয়াদ থাকবে।[৮]

এই সর্বজনস্বীকৃত বাস্তবতা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়, সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আসল উপাদান দ্বীন বা ধর্ম। ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়নকারীরা এই মূলনীতির ওপর একমত। সুতরাং এই ধর্মই জাতির মেজাজ, রুচিবোধ, সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর প্রভাবিত হয়। দীন দ্বারাই চরিত্র গঠিত হয়।[৯]

আবার এটাই চারিত্রিক অধঃপতনের কারণ হয়। কিন্তু এটা তখন, যখন তার অনুসারীরা সেটাকে মানুষের মনগড়া বিষয় সাব্যস্ত করেছে। সভ্যতা-সংস্কৃতি শুধু কিছু রসম-রেওয়াজ, চিন্তাধারা ও ধ্যান ধারণার সমষ্টি নয়, বরং সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় উপাদানটা প্রবল থাকে। যে কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা ও প্রথা-প্রচলনের ধারাবাহিকতা কোনো না কোনোভাবে ধর্মের সাথে গিয়ে মেলে। এ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই প্রথা-প্রচলন ও ধ্যান-ধারণা ধর্মের দৃষ্টিতে সঠিক না ভুল। সুতরাং অত্র আলোচনা হতে স্পষ্ট হয় যে, ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক গভীর। একটি হতে অন্যটি আলাদা করা সম্ভব নয়।

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য

বিশ্বায়ন যেমনিভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নিজেকে বাস্তবায়ন করতে চায় তেমনিভাবে সভ্যতা-সংস্কৃতিকেও স্বীয় রঙে রঙিন করতে চায়। রাজনীতি ও অর্থনীতির পরে এখন তার উদ্দেশ্য সংস্কৃতিকেও বিশ্বকরণ করা এবং গোটা বিশ্বে একই ধরনের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া।[১০]

এর লক্ষ্য হলো, প্রকৃতিগতভাবেই বর্ণ ও বংশে মানুষের মধ্যে সুনিশ্চিত প্রবল বৈপরীত্য পাওয়া গেলেও ভাষা, মেজাজ ও রুচিবোধ, চাল-চলন, আচার-আচারণ ও জীবনের মান, এমন কি চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে এবং তাদেরকে অভিন্ন মূল্যবোধে একীভূত করা হবে। সকল মানুষের ভাষা এক হবে। আর অবশিষ্ট ভাষাগুলো ইতিহাসের গর্ভে বিলীন করে দেয়া হবে। তাদের অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণা এক ধরনের হবে যাতে ধ্যান-ধারণার বৈপরীত্যের কারণে কোনো স্বার্থ অর্জনের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নকে যদিও এক শ্রেণি বিশেষ একটা গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের সবচে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক বিভাগই হলো সংস্কৃতি। কারণ রাজনীতি ও

অর্থনীতির বিশ্বকরণ তো বস্তুবাদের আলোকে করা হচ্ছে। আর সংস্কৃতির সম্পর্ক সরাসরি ধর্মের সাথে, বিশেষ করে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ জন্য ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতিসহ গোটা বিশ্বের সকল সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই নির্মূল করে শুধু মার্কিন ও পশ্চিমা সংস্কৃতি বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেয়ার অর্থ সরাসরি ধর্মের ওপর আঘাত হানা। বিশেষভাবে বললে, ইসলামের উপর আঘাত হানা। কারণ অন্য কোনো ধর্মের এমন বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই, যেমন আছে ইসলামের। কাজেই সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নকে মোটেই সহজ ভাবা উচিত নয়। এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের চেয়েও ভয়ানক এবং সুদূর প্রসারী।[১১]

মূলত সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য এটাই যে, পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রসার দ্বারা রাজনৈতিক স্বার্থ পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়ও যেন কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় এবং ভূপৃষ্ঠে এমন কোনো লোক অবশিষ্ট না থাকে যার মস্তিষ্কে পশ্চিমা নীতির বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন ও অভিযোগ খাড়া হবে, তার মুখ দিয়ে জায়নবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো শব্দ বের হবে, ফলে তার চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অন্য লোকও পথ খুঁজে পাবে এবং সে বিশ্বায়নের রাস্তায় অন্তরায় হবে! সংস্কৃতির বিশ্বায়নের মাধ্যমে মানসিক দাসত্বে অভ্যস্ত একদল অনুগত বিশ্বমানব তৈরি করাই এর প্রবক্তাদের মূল লক্ষ্য।

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ও আধুনিক সভ্যতার বিপর্যয়

বিশ্বায়ন (Globalization) নিয়ে মার্কিন জোটের যে- রাজনীতি সে সেক্টরে জোটগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের নিকট নতজানু আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ। বিশ্বঅর্থনীতি গ্রাস ও এক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিচালনা করছে World Trade Organization এবং সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বে রয়েছে জাতিসংঘের অধীনস্থ অনেকগুলো সাব-কমিটি, যেগুলোর কাজ হলো বিশ্বের সকল ভাষা ও চিন্তার জগৎকে বিশ্বায়নের আওতায় এনে তাদের নিজস্ব গতিতে পরিচালনা করা।[১২]

সকল ইচ্ছা এখনও সম্পূর্ণ পূরণ না হলেও সাংস্কৃতিক অঙ্গন আজ তাদের পুরো নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি Globalization বা বিশ্বায়নের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব আজ ছোট বড় সবার হাতের মুঠোয়। আমরা বিভিন্ন সময়ে বলে থাকি, সিনেমা হলে এখন আর ভাল মানুষ যায় না। ভাল মানুষ বলতে চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক পরিবার-পরিজন নিয়ে সিনেমা আজকাল আর তৈরি হচ্ছে না ।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের আসল লক্ষ্য মুসলমান

বিশ্বায়নের মাধ্যমে পরিচালিত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের টার্গেট পাশ্চাত্য সভ্যতা ছাড়া দুনিয়ার অন্যান্য সকল সভ্যতা-সংস্কৃতি যার মাধ্যমে চিন ও আফ্রিকার প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সভ্যতা-সংস্কৃতিও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ড. মুহাম্মদ মাখযুন-এর ভাষায়, এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের টার্গেট কিছু

কারণের ভিত্তিতে কেবলই মুসলমানগণ এবং তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তিনি এর যে কারণগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলো,

(ক) মুসলিম উম্মাহ বিশাল বস্তুগত সম্পদের অধিকারী। যেমন তেল, গ্যাস ইত্যাদি।

(খ) পশ্চিমাদের স্বীয় প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সেন্টার, ইউনির্ভাসিটি ও প্রাচ্যবিদদের মাধ্যমে একথা ভালভাবেই জানা আছে, মুসলিম উম্মাহকে সে সময় পর্যন্ত পরাজিত করা যাবে না যতদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে ইসলামি স্বাতন্ত্র্যবোধ টিকে থাকবে। এজন্য মুসলিম জাতিকে অধীনস্থ করার একই পথ, আর তা হলো মুসলিম উম্মাহর সেই বিপ্লবী ধর্মকে পরিবর্তন করে দিতে হবে, যে ধর্ম সকল ধরনের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করার শিক্ষা দেয়।[১৯]

(গ) ইসলামি শরিআহ, ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুন এবং ইসলামি আকাইদ ও নৈতিক ব্যবস্থাই প্রকৃত পক্ষে বিশ্বায়নের দর্শন ও তার বস্তুগত মূল্যবোধের সবচে বড় আতংক।[২০]

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের ফলে সকল ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ক্ষতির শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মুসলিম বিশ্ব। বিশ্বায়নের মাধ্যমে প্রভাবশালী মুসলিম জাতিকে গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়েছে। মুসলিম সমাজ যেমন নিজেদের ইমান, আমল ও চরিত্র হারিয়ে অধঃপতনের অতল গহ্বরে সমাধি রচনা করেছে তেমনি হারিয়ে ফেলেছে তাঁর স্বজাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, পাণ্ডিত্য ও বীরত্ব। নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভুলে বিজাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে জীবনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের ভয়ঙ্কর থাবা হতে মুসলমানদের রক্ষা করার পরিকল্পনা হাতে না নিলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে ইমানদীপ্ত মুসলিম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের কালো থাবা হতে মুসলমানদের রক্ষার জন্য ইসলামি সংস্কৃতির পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে কার্যক প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

ইসলামি সংস্কৃতির পরিচয়

ইসলামি সংস্কৃতির সর্বাত্মক সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, ইসলামি জীবনদর্শন ও জীবনবিধান অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়, তাই ইসলামি সংস্কৃতি। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের মূল বিশ্বাসের আলোকে যত নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়, তা সবই ইসলামি সংস্কৃতির অংশ। যাকে দীনও বলা হয়। আর এ জন্যই আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ : ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন।[২১]

ইসলামি জীবনচেতনা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো সংস্কৃতিই মুসলিম জাতির সংস্কৃতি হতে পারে না। তাই ইসলামি জীবন বিশ্বাসের বিপরীত ভাবাদর্শের কোনো আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচার কোনো মুসলিম সমাজে দেখা গেলে সাথে সাথে ইসলামি মনীষীগণ সেটাকে অন্য নাম দিয়ে প্রত্যাখান করেছেন। সেগুলোকে বিদআত, কুসংস্কার বা বিজাতীয় সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তা প্রত্যাখান করেছেন। আর তাই শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্পকলা ইসলামি ভাবধারার পরিচায়ক হতে হবে। নচেৎ তা ইসলামি সংস্কৃতির অঙ্গ হবে না। ইসলামি সংস্কৃতি বেমানান ও অশালীন বিষয়াদি পরিহার করতে বলে। আর ইমানভিত্তিক মার্জিত পরিশীলিত উন্নত পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা সম্বলিত সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। ইসলামি সংস্কৃতি যেমন ব্যাপক, তেমন আদর্শভিত্তিক ও সর্বজনীন। কাজেই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে প্রথম হল তাওহীদবাদ তথা মানব জীবনে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা, মানুষের সামাজিক জীবনে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সর্বজনীন নীতির প্রবর্তন। বিশ্বাস, চিন্তাধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন-কানুন, নীতি, প্রথা, আচার-আচরণ যেগুলো তাওহীদবাদ ও সর্বজনীন নীতির বিরোধী নয়, তাকেই ইসলামি সংস্কৃতি বলা যায়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও প্রগতিশীল শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। তাই স্বভাবতই ইসলামি অনুশাসনের প্রভাবে ইসলামে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে। ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলামি শরিআত নির্দেশিত মুসলিম জাতির জীবনপদ্ধতিই হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি। সংক্ষেপে ইসলামি সংস্কৃতির সংজ্ঞা হলো, এমন কিছু আকাইদ, বিশ্বাসমালা, চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা ও প্রথা প্রচলনের সমষ্টির নাম যা মুসলিম জাতিকে অন্য জাতি হতে পৃথক করে দেয়।

ইসলামি সংস্কৃতির গুরুত্ব

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের ফলে আধুনিক সভ্যতার যে বিপর্যয় শুরু হয় তার সমাধান একমাত্র ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতিই দিতে পারে। ইসলামি মূল্যবোধ বা ইমান তথা বিশ্বাসই হচ্ছে এ সংস্কৃতির প্রাণ। এ বিষয়ে কুর'আনে বলা হয়েছেঃ

كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ.

> অর্থ : পবিত্র কালিমা একটি বৃক্ষের মত যার শেকড় থাকে সুগভীরে প্রতিষ্ঠিত আর তার শাখা-প্রশাখা থাকে দিগন্ত বিস্তৃত।[২২]

ইসলামি সংস্কৃতির বিশালায়তন প্রাসাদকে অক্ষুণ্ন রাখা মুসলিম জাতির জন্য অপরিহার্য। ভাষা, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা, আচার-আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান সকল ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা মুসলমানের জন্য জরুরি। প্রত্যেক জাতি বা জনগোষ্ঠীর আলাদা আলাদা সংস্কৃতি বা কৃষ্টি রয়েছে। সে সংস্কৃতি ভাষা, পেশা, জীবনযাত্রা, ধর্ম, ভৌগোলিক সীমারেখা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে। হিন্দুদের জন্য হিন্দু সংস্কৃতি, খ্রিস্টানদের জন্য খ্রিস্টান সংস্কৃতি এবং ইয়াহুদিদের জন্য রয়েছে ইয়াহুদি সংস্কৃতি। আবার যেমন আরবদের দেশীয় সংস্কৃতি রয়েছে তেমনি রয়েছে পারসিকদের দেশজ সংস্কৃতি। তেমনিভাবে গোটা মুসলিম জাতির জন্য রয়েছে

ইসলামি সংস্কৃতি। যা অপরাপর সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি। কেননা, মুসলিম জাতি হচ্ছে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لاتم خير أمي أخرجت للناس تأمرون بالمعروف والنون عن المنكر وتُؤْمِنُونَ بالله و لو انت ايل العنب لكان خيرا لهم عليمُ المُؤْمِلون والكارتمُ القُونَ

অর্থ : তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণে পাঠানো হয়েছে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ইমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ইমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ইমানদার এবং তাদের অধিকাংশই ফাসিক।[২৩]

সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির সংস্কৃতিও সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই মহাবনী (সা.) অপরাপর জাতির সংস্কৃতি গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। বস্তুত ইসলামি সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির প্রত্যয়বাদই দুনিয়ায় উৎকৃষ্ট গুণাবলি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। এর মধ্যে মানুষের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মত প্রচণ্ড শক্তি নিহিত আছে। কাজেই অন্য কোনো জাতির সংস্কৃতি হতে ধার নেয়ার মত অভাব এখানে নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

অর্থ : আমি পবিত্র কুরআনে মানুষের প্রয়োজনীয় কোন বিষয় বর্ণনা বাদ রাখিনি। অতঃপর তাদেরকে হাশরের মাঠে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে।[২৪]

একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জীবন পদ্ধতি। আর ইসলাম হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য শাশ্বত সুন্দর আদর্শ জীবন পদ্ধতি। তাই এর অনুসারীদেরও রয়েছে একটি আদর্শ সংস্কৃতি। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সংস্কৃতি উৎসারিত ও লালিত, তাই ইসলামি সংস্কৃতি। আর এ সংস্কৃতি শাশ্বত সর্বজনীন ও শ্রেষ্ঠ আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যে সংস্কৃতির অনুসরণ ও অনুকরণে পৃথিবীতে এমন উৎকৃষ্ট গুণাবলী অর্জিত হয় যা পরকালে মানুষের জন্য নিয়ে আসে চিরমুক্তি ও আনন্দের জীবন। তাই ইসলামি সংস্কৃতি মানুষকে যেমনিভাবে সত্যিকারের মানুষ হতে সহযোগিতা করে তেমনিভাবে পরকালীন মুক্তির ব্যবস্থা করে দেয়। সুতরাং ইসলামি সংস্কৃতিই হতে পারে মানুষের জীবনে নিরাপদ অবলম্বন ।

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সংকট সমাধানে ইসলামের প্রস্তাবনা

ইসলাম শুধু ধর্মই নয় বরং এটি একটি জীবন ব্যবস্থা। মানুষ চলার পথে যত সমস্যা ও সংকটে পতিত হয় তার সমাধান ইসলাম। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য ইসলামকে দীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে নির্ধারণ করলাম।[২৫]

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের মাধ্যমে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পরিমাণ ক্ষতির শিকার হচ্ছে তা মূলোৎপাটন করার জন্য ইসলাম কিছু প্রস্তাবনা পেশ করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ সকল বিষয়গুলোর অনুসরণ করতে পারলে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের কালো থাবা হতে নিজেদের রক্ষা করা সম্ভব।

সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য কিছু মানুষের এগিয়ে আসা উচিৎ

মানুষ নিজ ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন নয় বিধায় সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন সহজেই মগজ ধোলাই করতে সক্ষম হচ্ছে। সাহাবা (রাঃ) ও মুমিনগণ যেসকল বিষয়ে জিহাদ করেছেন বর্তমান মুসলিমরা সেসকল বিষয়কেই মূল্যবান হিসেবে বিবেচনা করছে। ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রয়োগ করেও এসকল মানুষগুলোকে সঠিক পথে আনা সম্ভব হচ্ছে না। আর যে সকল মানুষ কোনো বিধি-বিধান মানতে নারাজ এবং যারা না জেনে, না বুঝে বিশ্বায়নের ফাঁদে পা দিয়ে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে, ধর্মের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে ধর্মের প্রতি যদি মায়া-মহব্বত বৃদ্ধি করা যায় তাহলে তাদেরকে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের নোংরা হাত হতে রক্ষা করা সম্ভব। কেননা যখন তাদের হৃদয়ে ধর্মের প্রতি মায়া জন্মাবে, কেয়ামতে আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর প্রতি ভয় সৃষ্টি হবে এবং নিজের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য'র কথা স্মরণ হবে তখন বিশ্বায়নে গা ভাসিয়ে দিতে তাদের মন একটু হলেও বাধা প্রদান করবে। এ কারণে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একদল লোক প্রয়োজন। যারা মানুষকে সুস্থ সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে। অসুস্থ সংস্কৃতির ক্ষতিকর দিকগুলো ধরিয়ে দিবে, নিজস্ব সাংস্কৃতিক ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে এবং বাস্তবিক ও ধর্মীয় দিকগুলো তাদের সামনে সূর্যের আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবে। সুস্থ সাংস্কৃতিক বিপ্লব আনতে হলে এমন লোক তৈরি করা জাতির জন্য ফরয হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসকল লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ولنكن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُلكَرِ وَ أُولَئِكَ بُمُ الْمُظْلِمُونَ

অর্থ : আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি মানুষকে আহবান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।[২৬]

ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে গুরুত্ব প্রদান

নিজের ধর্ম, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পর ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে এগিয়ে আসতে হবে। কেননা ধর্মীয় জ্ঞান হলো একটি ঘরের মজবুত ভিত্তি। সকল আসবাবপত্র রেখেও মজবুত ভিত্তি ছাড়া যেমনি একটি ঘর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না তেমনি ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া একজন মানুষ ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে না। অনেকেই হয়তো বলবে, 'ধর্মীয় জ্ঞান প্রয়োজন নেই, সাধারণ জ্ঞান অর্জন করলেই ভাল-মন্দ বিচার করা সম্ভব। তাদের জ্ঞাতার্থে আমি বলব, ধুমপান মৃত্যুর কারণ জানা সত্ত্বেও অসংখ্য ডাক্তার ধুমপান করে থাকেন! দেশে দেশে দুর্নীতি কিন্তু

মূর্খ লোকেরা করে না বরং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শিক্ষিতরাই করে! একারণে আল্লাহ তা'আলা ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কিত আয়াতের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন নাযিল শুরু করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

عَلَّمَ (٤)الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٣)اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٢)خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (١)إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (٥)ما لم نعم الْإِنْسَانَ

অর্থ : পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাক বা জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন যা সে পূর্বে জানত না।[২৭]

ধর্মীয় জ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

ترفع الله الذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أوتُوا الْعِلم ترختِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।[২৮]

আল্লাহ তা'আলার বাণীর পাশাপাশি রাসুল (সাঃ) ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ "عَنْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي

অর্থ : হুমায়দ ইবনু আব্দুর রহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুয়াবিয়াহ (রাঃ) কে খুতবায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসুল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে দীনের ইলম দান করেন। আমি তো বিতরণকারী মাত্র, আল্লাহই (জ্ঞান) দাতা।[২৯]

রাসুল (সাঃ) ইসলামি জ্ঞানের গুরুত্ব বর্ণনা করেই বসে থাকেননি বরং তাঁর প্রচার ও প্রসারে উৎসাহ দিয়েছেন। হযরত উসমান (রাঃ) সূত্রে রাসুল (সাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآن وعلمه

অর্থ : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।[৩০] বিশেষ করে মুসলিম নারীদের ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। কেননা মা তার সন্তানের প্রথম শিক্ষক। বাচ্চারা তাদের মায়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। মায়েরা যদি প্রথম থেকেই তাদের সন্তানদের মস্তিষ্কে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্পর্কে সুধারণা গেঁথে দিতে পারে তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনে তার সন্তান সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের থাবায় হারিয়ে যাবে না। এ কারণে রাসুল (সাঃ) নিজেও নারীদের ওয়াজ-নসিহত করে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ প্রদান করতেন।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَمَعَهُ

بِلال، قطن أنهُ لَمْ يُسْمِ اللمَاءَ فَوَعَظَهُنَّ، وأمر من بالصدقة، فجعلت المرأة تلقى القرط والقائم، وبالملُ يَأْخُذُ فِي وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .طَرْفِ تَوْبِهِ

অর্থ : ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবি (সাঃ) কে সাক্ষী রেখে বলছি, কিংবা পরবর্তী বর্ণনাকারী 'আতা (রহঃ) বলেন, আমি ইব্ 'আব্বাসকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, নবি (সাঃ) (ঈদের দিন পুরুষের কাতার থেকে) বের হলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রাঃ)। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ধারণা করলেন যে, দূরে থাকার জন্য তাঁর নসিহাত মহিলাদের নিকট পৌঁছেনি। ফলে তিনি তাঁদের নসিহাত করলেন এবং দান-খয়রাত করার উপদেশ দিলেন। তখন মহিলারা কানের দুল ও হাতের আংটি দান করতে লাগলেন। আর বিলাল (রাঃ) সেগুলো তাঁর কাপড়ের প্রান্তে গ্রহণ করতে লাগলেন। ইসমাঈল (রহঃ) 'আতা (রহঃ) সূত্রে বলেন যে, ইনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি নবি (সাঃ) কে সাক্ষী রেখে বলছি।[৩১]

সুতরাং জনসচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ধর্মীয় জ্ঞানের অধিক চর্চা সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের কালো হাত হতে আমাদেরকে রক্ষা করতে সবচেয়ে কার্যকর হবে বলে মনে করি।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পোষণ

কোন জাতি শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষায় পারদর্শী হলেই নিজেকে যুগের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তুলতে পারেনা। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইতিহাস সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় পা পিছলে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা পূর্বে যারা আলেম ছিলেন, তারাই একাধারে রাষ্ট্র পরিচালক, যুদ্ধের ময়দানে সেনাপ্রধান, জ্ঞানের শহরে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও একাধিক বিষয়ে বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁরা ভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির পূজা করেননি বরং নিজেরাই ধর্মীয় সংস্কৃতির চর্চা, প্রচার ও প্রসারে একাধারে শ্রম দিয়েছেন। তাঁদের দেখানো পথ অনুসরণে রয়েছে মুক্তি। ধর্ম ও সংস্কৃতিসহ সকল কিছুর প্র্যাক্টিক্যাল ভার্সন হল ইতিহাস। তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নবি-রাসুল ও বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে ইতিহাস বা গল্প উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَفِلِينَ

অর্থ : আমি তোমার নিকট সুন্দরতম কাহিনি বর্ণনা করেছি, এ কুরআন আমার ওহি হিসেবে তোমার কাছে প্রেরণ করার মাধ্যমে। যদিও তুমি এর পূর্বে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।[৩২]

এর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নে গা ভাসিয়ে দেয়া যুবকদের যখন এই ইতিহাস সম্পর্কে এভাবে ধারণা দেয়া হবে যে– তোমার ধর্ম ও সংস্কৃতি নারীদের মা, স্ত্রী ও কন্যার আসনে বসিয়ে মর্যাদা দিয়েছে। আর তুমি যাদের অনুসরণ কর তারা নারীদের ভোগের বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করছে। তোমার সংস্কৃতি শরীরচর্চা ও আনন্দ-বিনোদনকে বৈধভাবে উদযাপন করার ব্যবস্থা করেছে আর বিশ্বায়ন এগুলোকে যৌনতা ও ব্যবসার উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তোমার সংস্কৃতি সকলের অধিকার বুঝিয়ে দেয়াকে ফরয ইবাদাত হিসেবে গণ্য করে। আর বর্তমান বিশ্বায়ন তোমার, আমার ও সকলের অধিকারকে হরণ করেছে– তখন তাদের হৃদয়ের দৃষ্টি খুলে যাবে এবং নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে সুস্থ ও সুন্দর পরিবার এবং সমাজ গঠনে এগিয়ে আসবে। সুতরাং এ জাতিকে বিশ্বায়নের ছোবল থেকে বাঁচাতে চাইলে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস সম্পর্কেও সুধারণা প্রদান করতে হবে।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের হাত হতে নিজেদের রক্ষার জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়া একান্ত কর্তব্য। কেননা জ্ঞান-বিজ্ঞানে মূর্খতার সুযোগেই সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন আমাদের গ্রাস করছে। একারণে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন নাযিলের শুরুতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَى (١)الرا باشم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

অর্থ : পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাক বা জমাট বাঁধা রক্ত থেকে।[৩৩]

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ আমরা জানি আল্লাহ তা'আলা আমাদের বীর্য, মাটি ইত্যাদি থেকে সৃষ্টি করেছেন। বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা ছাড়া জমাট বাঁধা রক্ত সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে একজন মানুষ জানতে পারে কোনটি ভাল এবং কোনটি মন্দ, কোনটি স্বাস্থ্যকর এবং কোনটি অস্বাস্থ্যকর, কোনটি নিজের ও জাতির জন্য উপকার এবং কোনটি ক্ষতিকর। আর যখন একজন যুবক জানবে যে, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন আমায় রাত জেগে খেলাধুলা দেখিয়ে বা গার্লফ্রেন্ডের সাথে চ্যাটিং করিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করাচ্ছে, জীবনের লক্ষ্য হতে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, যৌনতা ও অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করছে, চোখের জ্যোতি ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে, তখন সে এমনিতেই আধুনিক বিশ্বায়নের গালে চপেটাঘাত মেরে নিজেকে সুস্থ, সবল ও সঠিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে।

সময়কে মূল্যায়ন

জ্ঞানীদের যদি প্রশ্ন করা হয়, পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু কী? তাহলে অবশ্যই তারা গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর মাঝে সময়কে অগ্রাধিকার দিবেন। কেননা সময়ের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই হতে পারে না। আর মুসলিমদের নিকট ইমানের পর সবচেয়ে মূল্যবান হলো সময়। একারণেই আল্লাহ তা'আলা সময়ের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য পবিত্র কুরআনের সময়ের কসম কেটে একটি সূরা নাযিল করেছেন।

إِلَّا الذين آمنوا و عملوا الصلحت وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا (٢)و التستر وام إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسترٍ

অর্থ : সময়ের কসম! নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ইমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।[৩৪]

রাসুল (সাঃ) সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন,

عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمان مَغْلُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ المِيمةُ وَالْفَرَاغُ

অর্থ : ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল (সাঃ) বলেছেন, এমন দুটি নিয়ামত আছে যে দুটোতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, তা হচ্ছে সুস্থতা এবং অবসর অর্থাৎ অবসর সময়।[৩৫]

যুগে যুগে যারা সময়ের গুরুত্ব দিয়েছেন তারাই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সক্ষম হয়েছেন। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন সময়কে অবমূল্যায়ন করে মানুষের জীবনকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। তাদের তৈরি আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম অর্থাৎ গুগল, ইউটিউব, ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ এবং খেলাধুলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সিনেমা ও নাটক যুবকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, পড়ার টেবিল হতে মন উঠিয়ে দিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ সময়কে হাসি-ঠাট্টায় নষ্ট করেছে। যুবকদের যদি সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে হাতে কলমে বুঝিয়ে দেয়া যায় তাহলে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের বিষাক্ত ছোবল হতে তাদের মূল্যবান জীবনকে রক্ষা করা যেতে পারে।

ইসলামি ও সুস্থ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা

আধুনিক বিশ্বের শিশুরা কার্টুন দেখে তাদের শিশু ও বাল্যকাল কাটিয়ে দেয়। এমনকি তাদের ঘুম পাড়ানো, খাওয়া- দাওয়া, গোসল সহ সবকিছুই কার্টুনের লোভ দেখিয়ে করাতে হয়। ভিনদেশী ও বিধর্মী কার্টুনের স্থানে ইসলামিক ও ইতিহাস নির্ভর ছোট ছোট মজার কার্টুন দেখিয়ে শিশুকাল হতেই তাদের মন ও মগজে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়া যেতে পারে। এতে করে শিশুরা ছোটবেলা হতেই নিজের ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সুধারণা রাখবে। যা তাদের হৃদয়ে নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি মায়া জন্মাতে সাহায্য করবে। এবং তার কাছে ইসলামিক সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা দিবে। যার ফলে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন খুব সহজেই তাদের হৃদয়কে দখল করতে সক্ষম হবে না। এর পাশাপাশি বড়দের জন্য ইসলামিক ও ইতিহাস নির্ভর সিনেমা, নাটক ও সিরিয়াল বানানো যেতে পারে। কেননা আমরা চাইলেই কোটি কোটি যুবক-যুবতিদের নাটক, সিনেমা ও সিরিয়াল দেখা হতে ফিরাতে পারব না। বরং বিজাতীয় সংস্কৃতির স্থলে যদি ইসলামিক ও ইতিহাস-ঐতিহ্য নির্ভর সংস্কৃতির চর্চা বাড়াতে পারি তাহলে অন্তত কিছুটা হলেও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের বিষাক্ত আঁচড় হতে জাতিকে রক্ষা করতে সক্ষম হব। ঠিক একইভাবে রাসুল (সাঃ)ও অমুসলিদের উৎসব দেখে মুসলিমদের উৎসবের জন্য দুটি দিনকে নির্ধারণ করেছিলেন।

رضي -قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ عَنْ عَائِشَةَ -الله عنها فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ -ا يَوْمَ بُعَاثَ "يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ

অর্থ : আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন আমার ঘরে) আবু বকর (রাঃ) এলেন। তখন আমার কাছে আনসারী দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধের দিন আনসারীগণ পরস্পর যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে গান গাইছিল। তিনি বলেন, তারা কোনো পেশাদার গায়িকা ছিল না। আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর ঘরে শয়তানী বাদ্যযন্ত্র। আর এটি ছিল 'ঈদের দিন'। তখন আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বললেন, হে আবু বকর, প্রত্যেক জাতির জন্যই আনন্দ উৎসব রয়েছে। আর এ হলো আমাদের আনন্দের দিন অর্থাৎ ঈদের দিন।[৩৬]

সুতরাং রাসুল (সাঃ) এর হেকমতকে অনুসরণ করে আমরা ইসলামি ও ইতিহাস নির্ভর কার্টুন, মুভি, নাটক ও সিরিয়াল তৈরি করে জাতিকে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের হাত হতে রক্ষা করতে পারি।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন

খেলাধুলা মানুষের মনকে আনন্দিত করে। শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি অর্জনে সাহায্য করে। একারণে রাসুল (সাঃ) নিজেও খেলাধুলা পছন্দ করতেন এবং সাহাবাদের খেলাধুলায় উৎসাহ দিতেন মর্মে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ أَجْرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّة -رضى الله عنهما -عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْوَدَاعِ وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضمر من الليةِ إلى مسجد فني زُرَيْقٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنتَنَا

سُفْيَانُ قَالَ حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَ الْمَنْبَاءِ إِلى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أو سِتَّةٌ، وَبَيْنَ ثَنِيَّةِ إِلَى مَسْجِد نَنِي زرتي منك

> অর্থ : ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অশ্বের জন্য হাফা থেকে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত এবং প্রশিক্ষণহীন অশ্বের জন্য সানিয়্যা থেকে বনু যুরায়কের মসজিদ পযন্ত দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। ইবনু 'উমর (রাঃ) বলেন, আমি উক্ত প্রতিযোগিতার একজন প্রতিযোগী ছিলাম। সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, হাফ্যা থেকে সানিয়্যাতুল বিদার দূরত্ব পাঁচ কিংবা ছয় মাইল এবং সানিয়্যা থেকে বনু যুরায়কের মসজিদের দূরত্ব এক মাইল।[৩৭]

স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রণনৈপুণ্যের প্রয়োজনে তীর নিক্ষেপ, বর্শা চালনা, ঘোড়দৌড় ও সাঁতার প্রতিযোগিতাকে ইসলাম সমর্থন করেছে। এসকল খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার চর্চা বাড়ানো উচিত। তাতে যেমনি করে রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাহ পালন হবে তেমনিভাবে বিনোদনের মাধ্যমে হৃদয়ে প্রশান্তি বিরাজ করবে। শারীরিকভাবে সুস্থ ও সবল থাকার পাশাপাশি ইবাদাতে মনযোগ ও তৃপ্তি বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে ইসলাম কর্তৃক বৈধ ও অবৈধ খেলাধুলার পার্থক্য চোখে পড়বে। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন খেলাধুলার মাধ্যমে কিভাবে মানুষের মুল্যবান সময় নষ্ট করে এবং ইবাদাতের প্রতি অনিহা তৈরি করে তা বুঝতে সক্ষম হবে। তাই সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের কালো থাবা হতে সুরক্ষার জন্য খেলাধুলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে ।

উপসংহার

বিশ্বের পরাশক্তিগুলো মানুষের মন ও মেধাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের লোভনীয় জাল বিস্তার করে রেখেছে। সাধারণ মানুষেরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, বুঝে না বুঝে, প্রকাশ্য কিংবা গোপনে এসব জালে অসহায়ের ন্যায় আত্মসমর্পণ করছে। এসকল মানুষগুলোকে রক্ষার জন্য ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে চায়। এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু মানুষ গঠন, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে গুরুত্বারোপ, ইসলামি ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সুধারণা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, সময়কে মূল্যায়ন, ইসলামি সাংস্কৃতির চর্চা ও ইসলামিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ কার্যকর প্রস্তাবনা পেশ করেছে। এসকল প্রস্তাবনা সমূহ বাস্তব জীবনে কার্যকর করতে পারলে দেশ ও জাতিকে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ইসলাম অত্যন্ত নমনীয় ও সংবেদনশীল একটি ধর্ম। এটি কোনো কিছুতেই চরমপন্থা অবলম্বন করাকে সমর্থন করে না। ইসলামি শরিআতকে মেনে

নিয়ে এর বিধি-বিধানকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে শরিআতের নির্দেশনা অনুসারে খাপ খাইয়ে নেওয়ার শিক্ষাই মূলত ইসলামের শিক্ষা। শরিআতের সীমার ভেতর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসরণকে ইসলাম নিষিদ্ধ করে না, যদি না সেগুলো অশালীন, অশোভন ও অমানবিক হয়। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের সংকটসমূহকে শনাক্ত করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এগুলোর মধ্য থেকেও নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ধারণ করা মুসলিমদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। আলোচ্য নিবন্ধে সে বিষয়টিই পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. নাজির আহমদ ও রুহুল আমিন, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, (ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯), পৃ. ০৯

২. আবদুর রহীম, *শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, (খাইরুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০), পৃ. ২৫০-২৫১

৩. Dr. A. Zaki Badawi, *A Dictionary of the Social Sciences*, English-Franch-Arabic, (Bairut: Librairie Du Liban, 1978), P. 92

৪. নাজির আহমদ ও রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫২

৫. ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, 'সমাজ,সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন, (*দৈনিক সমকাল*, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫), পৃ- ০৮

৬. নাজির আহমদ ও রুহল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৭. *আল কুরআন*, ০২:৩৮-৩৯

৮. ড. আহমাদ আইয়ূব সোলায়মান, *সংস্কৃতির বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ*, (ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশন, ২০০৯), পৃ. ৮৯

৯. ইমাম গাযযালী (র), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ২য় খণ্ড*, অনুবাদ: মওলানা মহিউদ্দীন খান, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০২), পৃ. ৬৭

১০. Dr Khurshid Ahmed, 'Why Global Capitalism Why not pluralist economy' (*Impact International*, Jan - February, 2004), p. 34

১১. Ibid, p.40

১২. John Ravenhill, *Global Political Economy*, (Oxford University Press, 2007), p. 27

১৩. আব্দুল লতিফ মাসুম, 'সুনাগরিক ও আগামী প্রজন্মের দুর্বায়ন' *(দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫), পৃ- ০৭

১৪. আব্দুল লতিফ মাসুম, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭

১৬. এ. কে এম সালাহউদ্দিন, 'বিশ্বায়ন আতঙ্ক; বিশ্ব সমস্যার সমাধান ও জটিলতা', *বিশ্বায়ন সংকট ও সম্ভাবনা*, মাসুদুজ্জামান ও ফেরদাউস হোসেন সম্পাদিত, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, নভেম্বর ২০১২), পৃ. ১৩

১৭. SS Report 2013, New York: John Hopkins Ltd, 2014, p.23

১৮. ibid, p. 24

১৯. আল আওলামাহ বাইনা মনযুরীন, *মাসিক আল বয়ান*, (সংখ্যা ১৪৫ মাহে রমযান, ১৪২০), পৃ. ১২৬

২০. ড. সালেহ আর রাকাব, *আল-আওলামাহ্*, (দিল্লী : দারুল হাদিস, তা.বি), পৃ. ২৬

২১. *আল-কুরআন*, ০৩ : ১৯

২২. *আল-কুরআন*, ১৪ : ২৪

২৩. *আল কুরআন*, ০৩ : ১১০

২৪. *আল কুরআন*, ০৬: ৩৮

২৫. *আল কুরআন*, ০৫:০৩

২৬. *আল কুরআন*, ০৩: ১০৮

২৭. *আল কুরআন*, ৯৬: ১-৫

২৮. *আল কুরআন*, ৫৮: ১১

২৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *বুখারী শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৭), প্রথম খণ্ড, হাদিস নং-৭১, পৃ. ৫৮

৩০. প্রাগুক্ত, নবম খণ্ড, হাদিস নং-৪৬৬১, পৃ. ২৮৫

৩১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, হাদিস নং-৮, পৃ. ৭৪

৩২. *আল কুরআন*, ১২:০৩

৩৩. *আল কুরআন*, ৯৬ : ১-২

৩৪. *আল কুরআন*, ১০৩

৩৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, প্রাগুক্ত, দশম খণ্ড, হাদিস নং-৫৯৭০, পৃ- ৩৫

৩৬. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, হাদিস নং-০৪, পৃ. ২০৭

৩৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, প্রাগুক্ত, পঞ্চম খণ্ড, হাদিস নং-২৬৭১, পৃ. ১২৭

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৪, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২৪

রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ : মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে সাহিত্যে সমাজভাবনার স্বরূপ

রোকাইয়া আক্তার*

Abstract

Ranesh Dashgupta(1912-1997) is a Marxist, theorist, journalist, political activist and a literary critic. Among multiple identities, his political entity shines brighter. He has shaded more focus on to critic the Bengali and world literature in the context of Marxist aesthetic rather than to write the creative Bengali literature. He wants to link up the literature in the way of making the communist society. To make it, he has highlighted the novel and poem to the readers as a weapon. Marxist writers have polarized themselves against capitalism in the name of human emancipation and they have linked it with literary life. Ranesh Dashgupta wants to bring into light pondering the world literature that is also closely related with the trend of political struggle for liberation. It is political Philosophy that has linked him to the demands of masses. According to Ranesh Dashgupta, how literature can play a role in building a communist society is the topic of discussion in the article.

চাবিশব্দ: Marxism, communism, socialism, novel, poem

ভূমিকা

রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭) মার্কসবাদী তাত্ত্বিক, রাজনীতিক, সাংবাদিক, সাহিত্যবোদ্ধা ও সমালোচক। তাঁর রাজনৈতিক বোধটি পরিবার-প্রযত্নে কিশোর বয়সেই তৈরি হয় এবং তিনি গণমানুষের মুক্তির মহৎ বিষয়টি নিজের কর্ম ও সাধনার সাথে যুক্ত করে নেয়ার প্রয়াস পান। রণেশ দাশগুপ্ত একজন মার্কসবাদী কর্মী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল সময়ে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে যান এবং পূর্ব-পাকিস্তান আমলেও তিনি একই ধারার বিপ্লবী রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার জন্য একাধিকবার গ্রেফতার হন। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধু সপরিবার নিহত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনার পর তিনি দেশত্যাগ করে কলকাতায় স্থায়ী হন। অশীতিপর আয়ুষ্কালে তিনি মানুষের জন্য রাজনীতি করেছেন, গণমানুষের সার্বিক মুক্তি নিয়ে ভেবেছেন। সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার আহ্বানকে কৌশলে পাশ কাটিয়ে তিনি বাংলাভাষায় মার্কসবাদী সাহিত্যসমালোচনা পদ্ধতিকে সমৃদ্ধ করতে আত্মনিয়োগ করেছেন। মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী সাহিত্যকে সাপ্তাহিক *সোনার বাংলা* পত্রিকায় তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্য, সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন ও চিন্তা স্পষ্ট; একজন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে তিনি পাঠকের সামনে উপস্থিত হন। মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব ও রাজনীতিবোধ রণেশ দাশগুপ্তের সমাজভাবনায় প্রাধান্য পায়। রণেশ দাশগুপ্ত শ্রমজীবী ও মেহনতি

* প্রভাষক, বাংলা (সংযুক্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাড্ডা, ঢাকা।

জনগণকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাপিত করার যে ব্রত ও সাধনা কর্মের দ্বারা ব্যাপ্ত রেখেছেন জীবনভর সে সম্পর্কে সৈয়দ আজিজুল হক বলেন–

> প্রগতিভাবনায় সর্বদা ভাবিত ছিলেন তিনি। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি অনুভব করেছেন একাত্মতা। শ্রমজীবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল সাহিত্যের ব্যাপারে এক ধরনের পক্ষপাত তাঁর ছিল। শোষণমুক্তির আদর্শকে সবসময় অঙ্গীকার করেছেন। অসাম্প্রদায়িক চেতনা, শোষণমুক্ত সমাজের প্রত্যাশা, আধুনিক ভাবনা প্রভৃতি তাঁর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে ছিল। তাঁর সব লেখারই উদ্দেশ্য ছিল সাম্যবাদী চিন্তা বা মার্কসীয় ভাবাদর্শকে নানাভাবে বিকশিত করে তোলা ও তার মহিমাকে প্রচার করা। সমাজের বৈষম্য, বৈষম্যের বিরুদ্ধে লোক-অভ্যুত্থান প্রভৃতিকে তিনি সন্ধান করেছেন সাহিত্যের মধ্যে। শ্রমজীবী জনতা ও নিপীড়িত বৈষম্যপিষ্ট লোকসমাজকে অঙ্গীকার করে সৃষ্ট সাহিত্যের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণেই ব্যাপৃত থেকেছেন তিনি।[১]

সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী দৃষ্টির প্রয়োগের ফলে তাঁর সাহিত্যচিন্তার সাথে সমাজভাবনার আয়ত দিকটি যুক্ত হয়ে যায়। লেখকের ব্যক্তিজীবন ও সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আবহকে বিবেচনায় রেখে তিনি সাহিত্য-সমালোচনায় ব্যাপৃত হন। দীর্ঘ জীবনের কর্মসাধনায় তিনি চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখেছেন এবং তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা পরিমিত। রণেশ দাশগুপ্তের দৃষ্টিতে সাহিত্যে সমাজভাবনার স্বরূপ, চিন্তা ও জিজ্ঞাসার উত্তর/প্রত্যয় ও প্রগতিসূত্রের সন্ধান করা এবং সে অনুযায়ী বিশ্লেষণ ও প্রতিপাদ্য অন্বেষণই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধের সমাজভাবনাকে বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনামূলক দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে আলোচ্য এই প্রবন্ধে।

রণেশ দাশগুপ্ত সাহিত্যের মাধ্যমে মানবসেবার পথ বেছে নিয়েছিলেন। সাহিত্যকে তিনি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। শিল্প-সাহিত্যে বিধৃত সমাজচেতনা মার্কসবাদীদের দ্বারাই সর্বাধিত নিরূপিত হয়েছে বিশেষত সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ করার প্রত্যয়ে। এক্ষেত্রে তাঁদের সমাজ-ভাবনা উদ্দেশ্যমূলক। রণেশ দাশগুপ্তের চেতনায়ও এই বিশেষ অঙ্গীকার কাজ করেছে সচেতনভাবে। মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রথমে বিষয় ও পরে শিল্পের কথা বলে। এই বিষয়ের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও রয়েছে সমাজভাবনার প্রাধান্য। তাত্ত্বিকভাবেই মার্কসবাদীদের চেতনার সাথে সমাজভাবনা যুক্ত হয়ে যায়। মার্কসবাদীরা সাহিত্যে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের অঙ্গীকার তুলে ধরেন। তবে মার্কসবাদের আবির্ভাবের আগেও সমাজচেতনা শিল্প-সাহিত্যে ছিল। *চর্যাপদ* অথবা *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* সমাজমূল্যও সাহিত্যের বিচারে কম নয়। সাহিত্যে সমাজ-রূপায়ণের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ বাঁক নিয়ে আসে। মূলত, কলাকৈবল্যবাদীদের সৌন্দর্যতত্ত্বের বিপরীতে মার্কসবাদীরা শিল্প-সাহিত্যে সমাজচেতনাকে গুরুত্বসহকারে ব্যবহার করেন। মানব মুক্তির জন্য মার্কসবাদীরা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সাহিত্যকে জীবনের সাথে যুক্ত করেন। শোষণমুক্তির সংগ্রামে লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকদেরও থাকে অগ্রণী ভূমিকা। এই ভূমিকাকেই জীবনের কর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। এই মতের সমর্থন আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধেও পাই—

> যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন।[২]

মার্কসবাদী প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (জ. ১৯৩৬), বদরুদ্দীন উমরের (জ. ১৯৩১) রচনায় সমাজচেতনার প্রকাশ দেখা যায়। তাঁরা মানবসেবার

উদ্দেশ্যে সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন। তবে সমাজকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁদের চিন্তার ভিন্নতা ও মতামত প্রকাশের মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। আহমদ শরীফ ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন। উদার ও মুক্তচিন্তার দ্বারা তিনি সমাজ-নৃতত্ত্ব-ইতিহাস-ধর্ম-দর্শনকে বিচিত্র রূপে তুলে ধরেছেন তাঁর প্রবন্ধে। আহমদ শরীফ ইউরোপীয় রেনেসাঁসকে দেখেছেন বুর্জোয়াদের সৃষ্টি বলে। তাঁর মতে শিল্প-সাহিত্যের এই নবজীবন নিম্নশ্রেণির মানুষদের মুক্তি দিতে পারেনি। সমাজে বিদ্যমান শ্রেণি-বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আহমদ শরীফ ইতিহাসের ধারায় সমাজের শ্রেণি-সম্পর্কের রূপটি তুলে ধরেন––

> তাহলে রেনেসাঁস রূপ সামন্ত বুর্জোয়ার চিৎপ্রকর্ষ গণমানবকে সমকালে কিছু দেয়নি বরং পীড়ন ও বঞ্চনা বাড়িয়েছিল শতগুণ। তাঁদের বিদ্যা-বিত্ত-জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা তাঁদের স্বশ্রেণির জীবনে ও জগতে বাসন্তী পরিবেশ তৈরী করেছিল মাত্র।[৩]

আহমদ শরীফ কলাকৈবল্যবাদী তথা বুর্জোয়া সাহিত্যের সৌন্দর্যবাদী দিককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য না করে তার সাথে যাপিত জীবনের প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ যোগ করতে চান। বাস্তবপ্রেক্ষিত তুলে ধরার পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য উর্বর, চিন্তাশীল ও প্রগতিবাদী সমাজ নির্মাণের কথা ব্যক্ত করেন তিনি। সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যয় আহমদ শরীফকে মধ্যযুগের সাহিত্য গবেষণার বিশাল পরিসরে নিয়ে যায়; তবে সমসাময়িক সাহিত্য, সাহিত্যচর্চা সম্পর্কেও তাঁর মতামত গুরুত্ববহ। সাতচল্লিশোত্তর ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে প্রথাবিরোধী ও মৌলবাদবিরোধী চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে আহমদ শরীফের মতামত স্পষ্ট। তিনি মধ্যযুগের সাহিত্যচর্চার ভিত্তিতে ইসলামিক অনুষঙ্গকে সাহিত্যের বিষয় হিসেবে নির্বাচনের মাধ্যমে জীবনের সাথে সাহিত্যের সংযোগ ঘটাতে চান। এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা সমন্বয়ধর্মী। সৌন্দর্যচিন্তা ও সমাজভাবনায় নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্বকে তিনি স্বীকার করেননি, তবে তাঁর চিন্তা অনেকাংশে মার্কসবাদীদের পক্ষে যেতে পারে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তত্ত্বচিন্তায় মার্কসবাদী হলেও রাজনৈতিক বক্তব্য প্রবল নয় তাঁর প্রবন্ধে। পুঁজিবাদ, সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর রচনা। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বরূপ-সন্ধান ও গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষকের ধারায় লিখেছেন। জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের যুগল উপস্থিতি তাঁর চিন্তার বিশেষত্ব। রাজনীতি ও রাষ্ট্রের নবতর নির্মাণে তিনি যৌক্তিক পথে হেঁটে প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রামের সাথে আদর্শিক সৈনিক হিসেবে নিজেকে যুক্ত করেন। স্বাধীনতাপূর্ব এবং স্বাধীন বাংলাদেশে পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক শাসনের অন্ধকার সময় থেকে দেশকে আলোতে আনার লক্ষ্যে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জাতীয়তাবাদের কথা বলেন। বৃটিশ সময়ে ভারতবর্ষে বিলাতি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, বিস্তার এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গেরও যে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটলো সে সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেছেন। জাতীয়তাবাদের হাত ধরে সাম্প্রদায়িক সংকট কীভাবে বাঙালি জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করল সে বিষয়েও যুক্তিশীল ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা আছে তাঁর প্রবন্ধে। তবে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জাতীয়তাবাদকে অপূর্ণ লক্ষ্য মনে করেন এবং সমাজতন্ত্রের অধ্যয়ন ও চর্চাকেই পরিপূর্ণ মনে করেন। বদরুদ্দীন উমরের প্রবন্ধে শিল্প-সাহিত্যে সমাজচেতনার দিকটি শিল্পীর অঙ্গীকার হিসেবে উঠে এসেছে। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কাছে সামাজিক দায়িত্ব স্বরূপ। তিনি বলেন, 'অর্থনৈতিক উৎপাদন থেকে শুরু করে মানুষের কোনো সৃষ্টিই একান্ত ব্যক্তিগত নয়।'[৪] 'শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত' সাহিত্যকেই তিনি সৃষ্টিশীল শিল্প-সাহিত্য বলেছেন। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সামাজিক উদ্দেশ্যের

কথা তিনি বলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো জাত-বুর্জোয়াও যে শেষ জীবনে নিম্নশ্রেণির কথা ভেবে তাঁর কাজকে সমাজমুখী করতে চেয়েছেন এই কথা বদরুদ্দীন উমর তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন––

> এখানে রবীন্দ্রনাথ শুধু শিল্পীর সমাজিক দায়িত্বের কথাই নয় কৃষক-শ্রমিকের জীবনকে অবলম্বন করে যে কাব্য সৃষ্টি সম্ভব তার সৌন্দর্য্য ও রসোত্তীর্ণতার কথাও বলেছেন। তাঁর এই বক্তব্য যে এক বিশুদ্ধতম কলাকৈবল্যবাদীর অন্তরে বিষম এক দ্বন্দ্বের পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই দ্বন্দ্ব তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকেই সৃষ্ট।[৫]

আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বদরুদ্দীন উমর, রণেশ দাশগুপ্ত এঁরা সকলেই গণমানুষের জন্য সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের পক্ষে কাজ করে গেছেন এবং তাঁদের কর্ম ও চিন্তা মার্কসবাদী আদর্শে পরিচালিত হয়েছে। রণেশ দাশগুপ্ত সাহিত্যের মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজ গড়ার কথা বলতে গিয়ে বাংলা সাহিত্য ও বিশ্ব সাহিত্যের বিশাল পরিসর থেকে উদাহরণ এনে তাঁর বক্তব্যকে পাঠকের সামনে উপস্থাপক করেছেন। জাতীয়তাবাদ, ধর্ম কিংবা ইতিহাসের মতো বিষয়কে ভ্রমন করে প্রবন্ধ রচনা করেননি রণেশ দাশগুপ্ত। বিশ্বমানবতার অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য অনুসরণীয় সকল বিষয় ও আঙ্গিককে তিনি শিল্প-সাহিত্যে প্রত্যাশা করেছেন। শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমাজ-চেতনার প্রশ্নটি পুঁজিবাদের ধ্বংসের যুগে মার্কসবাদীদের দ্বারা উত্থাপিত হয়েছে এবং এই বিষয় নিয়ে সাহিত্যের জগতে অনেক বিতর্কও চলেছে। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের নির্দিষ্ট ভূমিকার প্রশ্নটি সমাজ পরিবর্তনের সচেতন সংগঠিত প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত। মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে 'সমাজ' হচ্ছে চরিত্র বা অবলম্বন; এর ভেতরে শিল্পের গুণকে পুরে দেওয়া হয়। সমাজ থেকে শিল্প আলাদা নয়, আবার সমাজকে বাদ দিয়ে শিল্প বিকশিতও হতে পারে না। কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্য সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর বলেন, 'শিল্পী-সাহিত্যিকের সমাজচেতনা ও শিল্প-সাহিত্যের শ্রেণী বিচারের বিরুদ্ধাচরণ আধুনিক বুর্জোয়ার একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।'[৬] বুর্জোয়ারা তাঁদের স্ব-শ্রেণি অর্থাৎ ধনিকতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য শিল্পের কথা বলে। এই তত্ত্বটি বুর্জোয়াদের নিজস্ব সমাজ ও শ্রেণি-চেতনা এবং শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। শিল্প থেকে সমাজকে আলাদা করে বুর্জোয়ারা তাদের শ্রেণিগত কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায়। কলাকৈবল্যবাদী তত্ত্বে শিল্প-সাহিত্যকে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে উপস্থিত করে তার সামাজিক চরিত্র ও শ্রেণি-চরিত্র আড়াল করার চেষ্টা করা হয়। বুর্জোয়ারা মূলত এই কাজটি করে থাকেন তাদের শ্রেণিগত স্বার্থে। মেহনতি জনগণকে তারা শিল্প-সাহিত্য থেকে দূরে রাখতে চান। মার্কসবাদীরা বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের বিপরীত কাজটিই করেন, মেহনতি জনগণকে যুক্ত করে দেন সাহিত্যের সাথে। মেহনতি জনগণের শ্রেণি উঠে আসে সাহিত্যের কেন্দ্রে। মার্কসবাদীরা মনে করেন, ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও শৈল্পিক জীবন একই সূত্রে বাঁধা। তাই 'শ্রেণি চরিত্র' টিকেই আগে বুঝতে হবে, নির্ণয় করতে হবে তার কাঠামো। অন্যের নির্ধারিত কৃত্রিম কাঠামোর খোলস থেকে বেরিয়ে সৃজনশীল পথে মেহনতি জনগণকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান মার্কসবাদীরা।

বিশ শতকে এসে সাহিত্যের সাথে সমাজকে যুক্ত করার সচেতন প্রয়াস দেখা যায় মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এই কাজটির সূচনা করেন রণেশ দাশগুপ্ত। রণেশ দাশগুপ্তের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে তাঁর প্রবন্ধে। তিনি মনে করেন, শিল্পীর মধ্যে সমাজ-সচেতনতা এবং কলাকৈবল্যবাদী চিন্তা দুই-ই থাকতে পারে। তত্ত্বচিন্তার ক্ষেত্রে কোনো গোঁড়ামিকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। দেশীয় ও বৈশ্বিক সাহিত্য এবং নন্দনতত্ত্বের উপর তাঁর প্রচুর পঠন-পাঠন ছিল। সমাজচেতনার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্য বিবেচনায়। রণেশ দাশগুপ্ত

উপন্যাসকে সমাজচরিত্র নির্মাণের সহায়ক আঙ্গিক হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে শ্রেণি-চরিত্রের স্বরূপটি পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। *উপন্যাসের শিল্পরূপ* (১৯৫৯) গ্রন্থে তিনি উপন্যাসের নন্দনতত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে সমাজচেতনা প্রাধান্য দিয়েছেন। সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব উপন্যাসকে আধুনিক করেছে, 'জীর্ণ ও মরণোন্মুখ ধনতন্ত্রকে অপসারিত করে নবজীবনের ছাড়পত্র নিয়ে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে।'[৭] 'রোমান্টিক জগতের মায়াজাল' থেকে উপন্যাসকে বাস্তবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজতন্ত্র। উপন্যাসের বিষয় হিসেবে বাস্তবজীবনকে নির্বাচন করার প্রতি তিনি তাগিদ দেন–

> কালসিদ্ধ চিরায়তিকের জন্যে অযথা তদ্বির তদারক না করে, নতুন নতুন কাল বলয়ে জীবনের তাগিদে যা উঠে আসছে তাকেই উপন্যাসের শিল্পরূপে সার্থক করে তোলার প্রচেষ্টা করবেন সৃজনশীল শিল্পীরা।[৮]

সাহিত্য পরিবর্তনশীল। যে আঙ্গিকগুলো নতুন সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সমাজকে তুলে ধরতে পারে তাকেই ধরতে হবে। সমাজতন্ত্রের গণবিপ্লবের প্রস্তুতি উপন্যাসের শিল্পরূপকে গতিশীল করে তুলতে পারে। তিনি বলেন, সাহিত্যে সমাজচেতনার উল্লেখ শিল্প-সাহিত্যকে ভিন্ন দুই ধারায় বিভক্ত করেছে। যার একদিকে আছে মানবসমাজের মুক্তির দর্শন এবং অন্যদিকে আছে বুর্জোয়াদের রক্ষাকবচ। বুর্জোয়া শিল্পীরা সমাজচেতনার প্রতিবাদ স্বরূপ সাহিত্যে মনোবাস্তবতার রীতি নিয়ে আসেন। সৌন্দর্যতত্ত্বের আড়ালে নিয়ে যেতে চান সমাজ-ভাবনাকে।

বাংলা উপন্যাসের নিম্নশ্রেণির জনগণের প্রাধান্য ছিল; বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের জগৎ সমাজ অতিক্রম করে এই নিম্নশ্রেণি বিপ্লবী শ্রেণিতে পরিণত হয় শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী*-তে এসে। শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী* উপন্যাসে আছে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কথা তবে ঔপন্যাসিক শ্রমিক শ্রেণির উপরেই বিপ্লবের ভার দিয়েছেন। সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে 'কৃষকের শক্তি' ও 'পল্লীর শক্তি'কে তিনি বড় করে ভাবেননি। পল্লীর মধ্যে বিপ্লবের কোনো খোরাক পাননি শরৎচন্দ্র। রণেশ দাশগুপ্ত মনে করেন, 'সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প' আমাদের লেখকদের মধ্যে রয়েছে এবং বাংলা সাহিত্য ক্রমেই সাম্যবাদী শিল্প-ধারাকে আয়ত্ত করছে।' শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী* উপন্যাসে তিনি মেহনতি জনগণের সংগ্রামকে শ্রেণি-সংগ্রাম হিসেবে দেখেন। তাঁর ভাষায়, 'এঁরা সকলেই জীবনশিল্পী হিসেবে জীবন-সত্যকে সমস্ত অন্তর ঢেলে প্রকাশ করেছেন।'[৯] *পথের দাবী* উপন্যাসে শরৎচন্দ্র কৃষক সমাজকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বিপ্লবের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ভেবে শ্রমিক-শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত-শ্রেণির উপরেই দিয়েছিলেন নতুন সমাজ নির্মাণের দায়িত্ব। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষক সমাজকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন তাঁর *গণদেবতা* উপন্যাসে। অন্যদিকে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *দর্পণ* উপন্যাসে। এ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেন—

> যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তার পুরোপুরি চেহারাটা এখানে যেমন উদ্ঘাটিত হয়েছে, তেমনি যেসব শক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়িত করার জন্য সর্বশেষ সংগ্রামের প্রস্তুতির দিক দিয়ে তৈরি হয়েছে, তাদের চেহারাটাও পরিষ্কার বেরিয়ে এসেছে।[১০]

মানিকের মধ্যে সমাজচেতনা প্রবল ছিল বলেই তিনি তাঁর উপন্যাসের সর্বহারাদের কথা বলতে পেরেছিলেন। এই শ্রেণিচেতনাই মানিককে ফ্রয়েডীয় মনোজগত থেকে মার্কসীয় সমাজ দর্শনে নিয়ে যায়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) তাঁর *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু* গ্রন্থের 'উপন্যাস ও সমাজবাস্তবতা' প্রবন্ধে সমাজবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা উপন্যাসের ধারাকে বিশ্লেষণ করেছেন।

রণেশ দাশগুপ্তের সমাজভাবনার মৌল প্রবণতার সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা রয়েছে। সমাজকে তুলে আনার জন্য কবিতার জগৎ বাদ দিয়ে উপন্যাসের জগৎকে ইলিয়াস ব্যাপক, সংগঠিত এবং আরও দায়িত্বশীল মনে করেছেন। মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের প্রিয় ক্ষেত্র উপন্যাস কেননা এতে শ্রেণি-চরিত্রকে বিশাল ক্যানভাসে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। কবির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকলেও কথাসাহিত্যিকদের কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে সমাজকে তুলে ধরার অঙ্গীকারের কারণে। ঔপন্যাসিকের প্রবণতা সম্পর্কে ইলিয়াস বলেন—

> শিল্পীর মার্জিত রুচি বলে যা পরিচিত তাতে তাঁর সায় নেই। কিন্তু কবির মতো এককথায় তিনি কিছু নাকচ বা ঘোষণা করতে পারেন না।[১১]

মানুষের জীবনের ভেতরের স্পন্দনটিকে বের করে আনেন শিল্পী। মূলত, সমাজকাঠামোর ভেতরে থেকেই ব্যক্তিসত্তা বিকশিত হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র ও মধুসূদন দত্তের রচনার কথা উল্লেখ করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেন, সমাজ মূল্যায়নে তাঁদের লেখায় রক্ষণশীলতা থাকলেও সমাজকে তুলে আনার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে সচেতনতা ও মনোযোগ ছিল। 'সমাজ ফুঁড়ে ব্যক্তি আসে' তাই সমাজব্যবস্থার জীবন্ত প্রকাশ থাকবে সাহিত্যে। সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করেই ব্যক্তিজীবন বিকশিত হয়। লেখক বলেন, প্রতিক্রিয়াশীল লেখকের পক্ষেও সমাজব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে উপন্যাস রচনা করা সম্ভব নয়। রণেশ দাশগুপ্ত ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াস দুজনেই উপন্যাসকে সমাজ-চরিত্র প্রকাশের মূল আঙ্গিক হিসেবে স্বীকার করেছেন। আহমদ ছফার 'রণেশ দাশগুপ্ত: একজন প্রেমে পড়া মানুষ' শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধের একটি বক্তব্য নিম্নরূপ—

> রণেশদা বলেন, কবিতা অবশ্যই লিখবে। তুমি শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে অনেক কথা লিখতে পারো, যারা কবিতা লেখে, তাদের পক্ষে সেটা অনেক সময় সম্ভব নয়। সুতরাং গদ্যে শ্রমজীবী মানুষদের বিষয়ে কিছু লিখতে চেষ্টা কর।[১২]

উপন্যাসের মধ্যে সমাজকে বিশ্লেষণ করার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। রণেশ দাশগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়ও সমাজভাবনার ছবি উদ্ধার করেছেন। কিন্তু আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রক্ষণশীল। বঙ্কিমের রচনায় ধর্ম ও নীতিকে উপরে তুলে দিয়ে 'আরামদায়ক' উপসংহারের অভিযোগ করেছেন ইলিয়াস। তবে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীন এবং এখানেই সামাজিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা।

জ্যাঁপল সার্ত্রে, আলবেয়ার কামু, লুই আরাগঁ প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের শিল্প-চেতনায় রণেশ দাশগুপ্ত লক্ষ করেছেন সমাজ-সংগ্রামের ধারাবাহিকতা। সমাজ-সংগ্রামের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে ফরাসি সাহিত্যে মানবতাবাদী শিল্পীর প্রতিবাদের ভেতর দিয়ে। সার্ত্রে দর্শন নিয়ে অধিক পরিমাণে লিখেছেন, তাঁর রচনায় জগৎদর্শনের চাইতে মানবদর্শনই বেশি উচ্চারিত হয়েছে। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা মেহনতী জনগণের মুক্তির বাস্তবতা' এই তত্ত্বের প্রয়োগই সোভিয়েত সাহিত্যকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়। সোভিয়েত ঔপন্যাসিকগণ ব্যক্তিচরিত্রের মধ্য দিয়ে সামাজিক সারবস্তু ও সারমর্মকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। শিল্পী আর মেহনতি জনতা একাত্ম হয়ে গেছে সমাজ বিনির্মাণের বিপ্লবী পথে। এই সমাজতান্ত্রিক দেশের শিল্প-সাহিত্য পুরো বিশ্বসাহিত্যকে গণমুখী করেছে। 'দস্তয়েভস্কি: দিন বদলের পালায়' প্রবন্ধে লেখক দস্তয়েভস্কির উনিশ শতকের উপন্যাসকে বিশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলিয়ে দেখেছেন। পশ্চিমা তাত্ত্বিকরা দস্তয়েভস্কিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন

এবং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ভাবের লড়াইয়ে নিয়োজিত করেছিল। মূলত, দস্তয়েভস্কিকে তারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে চালিত করতে চেয়েছিল 'দস্তয়েভস্কিকে পৃথক মতের, পৃথক ভাবাদর্শের' উল্লেখ করে। টলস্টয় ও দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের ধারাকে একই সূত্রে রেখে বিশ্লেষণ করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত–

> কারণ দুজনেই যুগযুগান্তের বঞ্চিত ও দুঃখী জনগণকে তাদের শিল্পরূপের মর্মকেন্দ্রে গভীর আন্তরিকতা দিয়ে অধিষ্ঠিত রেখেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, দার্শনিক বক্তব্যের তলা খুঁড়লে দুজনেরই লেখা থেকে বেরিয়ে আসে কোটি কোটি ভূমিদাসের মুক্তির আর্তি।[১৩]

দস্তয়েভস্কির সৃষ্টির মধ্যে প্রতিক্রিয়াপন্থী সূত্রগুলির তুলনায় বিপ্লবী সত্যগুলি প্রবল– এমনটিই লেখকের বিশ্বাস। উপন্যাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মানবিক আকাঙ্ক্ষা বিশ্লেষণের প্রতিই প্রাবন্ধিকের ঝোঁক বেশি, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার প্রবণতা তাঁর প্রবন্ধে নেই। শোষণমুক্ত সমাজ প্রস্তুত ও তাকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েত উপন্যাস অগ্নিপরীক্ষার দ্বারা সফল হয়েছে বলে মনে করেন প্রাবন্ধিক। *আলো দিয়ে আলো জ্বালা* (১৯৭০) প্রবন্ধগ্রন্থে তিনি শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* নাটকে প্রাবন্ধিক সমাজ নির্মাণের ছাপ দেখেছেন; আরও উল্লেখ করেছেন বুর্জোয়া সাহিত্যের প্রতি শিল্পীর অনীহার অভিব্যক্তিকে। 'সোনার দলা'কে তুচ্ছ করে রবীন্দ্রনাথ মাটির উপরে নিম্নশ্রেণির মেহনতি জনগণের জন্য সাম্যবাদী সমাজ গঠনের চেষ্টায় রত। প্রতীকের আড়ালে রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদী সমাজের পতনের চিত্র এঁকেছেন। *রক্তকরবীর* সমাজবাদী বিশ্লেষণের পর পুঁজিবাদের সমালোচনা করে প্রাবন্ধিক বলেন, 'পুঁজিবাদ এর সমাধা করতে পারেনি, পারবে না। এর সমাধানের তাগিদ নিয়ে এসেছে, আসছে সাম্যবাদী সমাজ।'[১৪] রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে নিম্নশ্রেণির জীবনের কথা ভেবে তাদের প্রতি একাত্ম হয়ে *ঐকতান* কবিতাটি লিখেছিলেন। কবিতায় তিনি স্বীকার করেন, তাঁর কবিতা সর্বত্রগামী হয়নি। সততা শিল্পীকে বাস্তব ভূমিতে নিয়ে আসে। রণেশ দাশগুপ্ত *পূর্ববঙ্গ গীতিকার* মধ্যে মহৎ শিল্পরূপ খুঁজে পান প্রান্তিক মানুষের উপস্থিতির কারণে। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন, শিল্পী-সাহিত্যিকদের রচনায় তাঁদের স্ব-শ্রেণিচেতনার ছাপ থাকে। তাঁরা তাঁদের শ্রেণিদর্শনকে সমগ্র সমাজের দর্শন বলে প্রচার করতে চান। সার্থক শিল্পে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন চরিত্রের ছাপ থাকবে এবং তা তুলে ধরার ব্যাপারে শিল্পীকে নির্মোহ থাকতে হবে। সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আবির্ভাব শিল্প-সাহিত্যের সাবেক ধরনের চরিত্রের নির্মাণের ক্ষেত্রেও রদবদল ঘটিয়েছে। সমকালীন বিশ্বসাহিত্য থেকে তিনি বুর্জোয়া নায়কদের পতনের চিত্র তুলে ধরে বলেন, তারা পুরাতন হয়ে গেছে। সাম্যবাদী জনতা সাহিত্যের কেন্দ্রে চলে আসছে–

> পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হতে চলেছে। এখন ইতিহাসের মূল নায়ক হয়েছে মেহনতী জনসাধারণ। মেহনতী জনসাধারণের লোকই হবে এখন উপন্যাসের নায়কনায়িকা।[১৫]

সমাজের নরনারীদের কথা বলতে গিয়ে জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্যের পথে শিল্পীও শরিক হয়ে যান; তাঁর ব্যক্তিত্বকে অসংখ্য শ্রেণির মানব-মানবীর মাঝে বিশ্লিষ্ট হতে দেখি। বিশ শতকের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল বাস্তবের গুণগত পরিবর্তন; এই পরিবর্তন উপন্যাসেই অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

উপন্যাসের পরেই তিনি কবিতার কথা বলেছেন; কবিতা বিস্তারিতভাবে ভাব প্রকাশ না করলেও ব্যক্তি ও সমাজের বিবেক ও বোধে নাড়া দিতে সক্ষম। কবিতার সুর আর জনতার সংগ্রামকে একই সূত্রে বাঁধতে পারেন একজন শিল্পী। শিল্পী ও জনতার এই ঘটকালির পথেই আসতে পারে জনসমাজের মুক্তি। সমাজমুক্তির তাগিদে কবিতা রচনায় মাতৃভাষা প্রয়োগের কথা বলেন প্রাবন্ধিক––

> কবিতা ও মাতৃভাষাকে একত্রীভূত ভাবে দেখার যে তাগিদ সেটি হচ্ছে মানব সমাজের মুক্তিসংগ্রামের অদম্য বিকাশের তাগিদ।[১৬]

রণেশ দাশগুপ্তকে কিশোর বয়সে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) কবিতা আকৃষ্ট করেছিল। কারণ, তাঁর মতে 'নজরুলের কবিতায় নবযুগের প্রভাব পড়েছিল।' বয়স বৃদ্ধির সাথে, লেখক গণমানবের ও রাজনীতির সাথে যত বেশি সক্রিয় হয়েছেন, নজরুলের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা তত বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে নজরুল এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন। এই কারণে সাহিত্য বিবেচনার ক্ষেত্রে নজরুল আলাদা মূল্য পেয়েছেন। 'নজরুল কাব্যপ্রবাহের জঙ্গম বিচার' প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যে নজরুলকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি, কায়েমি স্বার্থবাদীরা কবিকে ফ্রেমের মধ্যে বন্দি করে ফেলেছেন। লেখকের ভাষায়, 'যে যুগে নজরুল কবি-প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল, আমরা তার সর্বতোমুখী শতদল-রূপকে বুঝতে পরাঙ্মুখ থেকেছি।'[১৭] নজরুলের কোরাস ও গজলকে, প্রেম ও বিদ্রোহকে পরস্পর থেকে আলাদা করার চেষ্টা করা হয়েছে। নজরুলকে সাম্প্রদায়িক ফ্রেমে আটকানোর আরও একটি অপচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন লেখক, 'যাঁরা নজরুল-কাব্যপ্রবাহকে ফ্রেমে বাঁধবার জন্য সচেষ্ট, তাঁরা নজরুলের কবিতা থেকে পুরাণকে বাদ দেওয়ার জন্য তাত্ত্বিক নিয়োগ করেছেন।'[১৮] বরং নজরুলের গণমুখী ধারাকে সর্বতোভাবে বিশ্লেষণে এনেছেন লেখক। এই গণমুখী সহজিয়া ধারায় নজরুলকে যুক্ত করে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত *প্রগতি সাহিত্য* গ্রন্থে নজরুলকে বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় চন্ডিদাস বা দ্বিতীয় 'মানুষের কবি' বলে যে আখ্যা দেয়া হয় তার সঙ্গে লেখক সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন। রণেশ দাশগুপ্ত নজরুলের কাব্যের মিল খুঁজতে গিয়ে সমকালীন সমাজ মনস্কতার পাশাপাশি ঐতিহ্য ও আধুনিক কবিতার ধারায় মিশে যাওয়া এক অভিনব শিল্পরীতির চিত্র তুলে ধরেছেন। যুগের প্রভাব নজরুলকে সমকালীন সমাজের সাথে যুক্ত করে দেয়। সমাজমুক্তির আকাঙ্ক্ষা নজরুলকে মানুষের কবিতে পরিণত করেছিল।

জীবনানন্দ দাশকে (১৮৯৯–১৯৫৪) অনেক কাছ থেকে দেখেছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরাপালক* (১৯২৮) বের হওয়ার পর অল্প কিছুদিনের মধ্যে তা পড়ার সুযোগ হয়েছিল লেখকের। *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার* ষাটের দশকে প্রকাশিত হয় রণেশ দাশগুপ্তের সম্পাদনায়। জীবনানন্দ দাশকে প্রকৃতির কবি, ধূসরতার কবি, নৈরাশ্যবাদী কবি ইত্যাদি বিশ্লেষণে চিহ্নিত করে কবিতার মূলধারার বাইরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কবির কবিতায় রূপকথাধর্মিতা বা নৈরাশ্যবাদিতার সুরই প্রবল– এ ধরনের কিছু বিশ্লেষণ প্রচলিত ছিল। তবে জীবনানন্দ উদ্দেশ্যহীন বা উত্তরণহীন নন এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে রণেশ দাশগুপ্তের 'মার্কসবাদীর চোখে জীবনানন্দ দাশ' প্রবন্ধে। পূর্বের প্রচলিত সমালোচনা খণ্ডন করে লেখক দেখিয়েছেন, শ্রমজীবী জনগণের বৃহত্তর আশাও তাঁর কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে। নৈরাশ্যই তাঁর কবিতার মূল সুর নয় বরং জীবনের ইতিবাচকতাই তাঁর কবিতায় সর্বত্র প্রকাশিত। স্বদেশে এবং বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে মানবিক সামাজিক উত্তরণকেই আমল দিয়েছেন কবি। তাঁর কবিতায় নৈরাশ্য বা মৃত্যু শেষ কথা নয়।

আত্মনিমগ্নতা শেষ কথা হলে কবির কবিতায় 'আমি' অজস্রভাবে 'আমরা' হয়ে উচ্চারিত হত না। এই 'আমরা' আশাবাদী চেতনার প্রতীক। লেখকের ভাষায়, 'বিচ্ছিন্ন আত্মবোধ সে তাঁর কাছে বরং ধিক্কারই পেয়েছে।'[১৯] জীবনানন্দের কবিতার দ্বন্দ্বকে স্বীকার করেছেন লেখক; ক্রান্তিকালের ঘাত-প্রতিঘাতে এ দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক লেখকের দৃষ্টিতে। তবে এ দ্বন্দ্বের ব্যাপারে কবিমনে কোনো আক্ষেপ ছিল না। এই পারস্পরিক বিরোধিতা বা দ্বন্দ্বকে 'অগ্রসর গতিবাদের পরিপোষক' হিসাবে দেখেছেন লেখক। পাখি, শকুন, পেঁচা, ডাহুক, শালিক, হাঁস– এরা কবির কাছে জীবনের স্পন্দনের প্রতীক। জীবনের স্পন্দনকে বুঝাতে লেখক জীবনানন্দের *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থের *'রিস্টওয়াচ'* কবিতার লাইন তুলে ধরেন–

> 'স্তিমিত স্তিমিত আরো করে দিয়ে ধীরে
> ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।'[২০]

জীবনানন্দের কবিতায় শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস নেই; যদিও মানুষের সমগ্র ইতিহাসে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে তিনি যাতায়াত করেছেন। তবে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক গতিধারাকে কবি আমল দিয়েছেন। লেখক একথা বলতে চাননি যে, জীবনানন্দ মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অথবা, বলা যেতে পারে লেখক মার্কসবাদী তত্ত্বকে আরোপ করেননি বা চাপিয়ে দেননি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে কবিকে মূল্যায়ন করেছেন লেখক–

> মার্কসবাদী হিসেবে তাঁর কবিতা তিনি লেখেননি। একজন বিঘোষিত বস্তুবাদী হিসেবে তিনি প্রকৃতির ডায়ালেকটিক্সকে সামনে আনেননি। সমাজবিপ্লবের চাবিকাঠি হিসেবে শ্রেণীসংগ্রামকে তিনি বোঝেনওনি দেখতেও পাননি। কিন্তু মার্কসবাদীরা জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে সমাজ বিপ্লবের অন্যতম উপকরণ হিসেবেই গ্রহণ করবে। কারণ তাঁর কবিতার মধ্যে রয়েছে লোভ ও নীচতাকে অতিক্রম করে মানুষের এগিয়ে চলার তাগিদ। মার্কসবাদীরা যে নতুন জগৎ গড়ে তুলতে চাইছে তার অঙ্গীকার জীবনানন্দ দাশের কবিতায় উপস্থিত।[২১]

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬- ১৯৪৭) রণেশ দাশগুপ্তের প্রিয় নাম। মানবকল্যাণে বা সমাজবিপ্লবের পথে তাঁরা দুজনেই সহযাত্রী। 'যৌবনের সজীবতা' ও 'প্রাজ্ঞের অভিজ্ঞতা' সুকান্তকে-বলিষ্ঠ করেছে এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে 'সুকান্ত-নিকষিত হেম' প্রবন্ধে। সুকান্তের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে লেখক নজরুলের 'বিদ্রোহী'র পাশাপাশি রেখে বিচার করেছেন 'ছাড়পত্রে'র (১৩৫৪)। সুকান্তের কবিতায় সমসাময়িক জীবনের ছাপ আছে এবং জনতার মধ্যে কবি ডুব দিয়েছিলেন। লেখক যথার্থই বলেছেন,'সুকান্ত সবসময়ই মৃত্যুর ছায়াতে বসে জীবনের জয়গান গেয়েছে।'[২২] সুকান্ত ভট্টাচার্যও জনতার মুক্তির তাগিদেই যুক্ত হয়েছিলেন কবিদের কাতারে, তিনি জানতেন তাঁর মৃত্যু আছে কিন্তু জনতার মৃত্যু নেই। এই কিশোর কবি ব্যক্তিগত সকল চাওয়া-পাওয়া কে উৎসর্গ করেছিলেন দেশবাসীর মুক্তির সংগ্রামে। প্রাবন্ধিকের ভাষায়, 'সে জানতো যে, এই সংগ্রামে তাঁর মৃত্যু এবং আরো অনেকের মৃত্যু হবে, কিন্তু এই প্রাণোৎসর্গেই অচলায়তন ধ্বংস হবে।'[২৩] শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবার জন্য মেহনতি মানুষের সহজ, সরল প্রত্যাশা ও সংকল্প স্লোগানের আদলে পেশ করেছেন সুকান্ত।

'গিওর্গি লুকাচ: মার্কসীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের অফুরন্ত খনি' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক হাঙ্গেরির বিপ্লবী লেখক লুকাচের সৌন্দর্যচেতনার সাথে সমাজের সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। লুকাচ ছিলেন কর্মঠ মানুষ, 'শ্রমজীবীরা যে শোষণমুক্ত বিশ্ব গড়বার জন্য ব্যাপৃত, একজন শ্রমজীবীর মতোই সৌন্দর্যের দিকটাকে লুকাচ পরিস্ফুট করে গেছেন।'[২৪] ইতিহাসের নায়ক শাসকশ্রেণি নয়, শোষিত শ্রেণি।

সাহিত্য এই শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করবে। ব্যক্তিগত জীবনদর্শন লুকাচের চেতনাকে চালিত করেছে, যা তাঁর সাহিত্যে নতুন সমাজ গঠনের অঙ্গীকার হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে। 'মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক বিপ্লবী সত্তা' প্রবন্ধে লেখক মুনীর চৌধুরীকে নাট্যকার হিসেবে নয় বরং তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিসত্তাকেই সামনে এনেছেন। কমিউনিস্ট চেতনা আর সাহিত্যকে একই পাত্রে রাখা সহজ কাজ নয়। রাজনীতি ও সাহিত্যকে একাত্ম করতে গিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল মুনীর চৌধুরীর মধ্যে। এক সময়ে প্রথাগত রাজনীতি ত্যাগ করলেও সাহিত্যকে গণমানুষ ও সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি মুনীর চৌধুরী। *কবর(১৯৫৩)* নাটকটি সাহিত্য আর বিপ্লবী রাজনীতিকে একাত্ম করে একজন বিপ্লবী লেখককে আমাদের সামনে এনেছে।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের দ্বারা সমাজ নির্মিত হয়েছে তাই ইতিহাসকে সমাজের সাথে যুক্ত করে শ্রেণি-সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াটিকে তুলে এনেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। জীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রম ছিল প্রাথমিক বা আদি উপাদান। হাতিয়ারের তৈরি এবং মেহনতকে ভিত্তি করে দলবাঁধা মানুষ অর্থনৈতিক সমাজ গড়ে তোলে। হাতিয়ার উন্নত হবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক সমাজে রূপান্তর ঘটে। সমাজ সক্রিয় হয় বিভিন্ন ব্যক্তির এক সূত্রে গাঁথা সক্রিয় সহযোগিতায়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ হয় সমাজের দ্বারা। মানুষ প্রকৃতিকে দেখে সমাজের প্রচলিত রীতি-বিধানের দ্বারা। অর্থনৈতিক মুনাফা কাঠামোকে ভিত্তি করে সমাজের দল বাঁধা মানুষ শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মেহনতি মানুষ মূলধন হারিয়ে নিম্নশ্রেণিতে পরিণত হয়। আদিম সামাজে জীবিকার পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্যের বিকাশও ঘটে। মেহনতি জনগণ জীবিকা নির্বাহের পরে গুহার গায়ে চিত্র এঁকে তাদের শিল্পীমনকে লালিত করে শিল্প ও মননের দিকে ধাবিত হয়েছে। জীবিকা ও মননের সমন্বয় করতে গিয়ে উদ্ভব হয়েছে সমাজচেতনার। মেহনতি জনগণকে শিল্প-সাহিত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে মননের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছে শোষক-শ্রেণি। শ্রেণি-সমাজের এই সংগ্রাম নিরন্তর চলছে। শিল্পীকে এই শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি হয়ে সাহিত্যকে এই সংগ্রামের সাথে যুক্ত করার প্রত্যাশায় শিল্পীদের উদ্দেশ্যে প্রাবন্ধিক বলেন––

> শিল্পীরা ধনিকতন্ত্রের প্রতি বিরূপ হতে বাধ্য, কারণ বুকের রক্ত ক্ষরিয়ে তাঁদের জানতে হয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদ বা ফ্যাসিবাদ হচ্ছে মূলত ধনিকতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ "সভ্যতার সংকট" নিবন্ধে এই চেতনাকে দিয়েছিলেন অগ্নিবাণী। ..... ধনিকতন্ত্রের প্রতি বিরোধীতার পরবর্তী পদক্ষেপ সমাজতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব।[২৬]

শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যাশায় শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রাম সাহিত্যের জগতে জায়গা করে নিয়েছে। রণেশ দাশগুপ্তের সমাজভাবনায় মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব নতুন সাম্যবাদী সমাজ গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে উপস্থিত। সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্য জীবনধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ তার প্রভাব বিস্তার করার জন্য জনগণের সংস্কৃতিকে দখল করতে চায়। সাহিত্য সংস্কৃতির অংশ। প্রাবন্ধিক আশাবাদী উচ্চারণ করে বলেন, 'প্রচণ্ড নিপীড়ণের মুখেও জনগণ তাদের সংস্কৃতিকে জীবন্ত রাখে।[২৭] একটি সফল বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর যদি বিপ্লবের ফলাফল প্রতি-বিপ্লবীদের হাতে চলে যেতে পারে তাই বিপ্লব সম্পন্ন করার পরেও পুনরায় নতুন সমাজ নির্মাণের জন্যে নতুন সংগ্রামে নামতে হয়। প্রাবন্ধিক বলেন, বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের জন্য প্রয়োজন বিপুল সামাজিক শক্তি যার পুরোভাগে থাকবে শ্রমিক-শ্রেণি। সমাজতন্ত্রকে সঠিক বিন্যাসের দ্বারা সাম্যবাদে পৌঁছে দিতে হবে। বিশ শতকের নব্বইয়ের

দশকে এসে সোভিয়েট সমাজতন্ত্র ভেঙে যায়, পুঁজিবাদী ভোগবাদের পুনরুত্থান ঘটে। এই সময়ে সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের প্রশ্নে নতুন নতুন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়েছেন রণেশ দাশগুপ্ত। *সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা: আত্মজিজ্ঞাসা* গ্রন্থে লেখক সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের নতুন স্বপ্নকে ইতিহাসের ধারায় তুলে ধরে অতীতের সাথে ভবিষ্যতের সংযোগ ঘটান যা বর্তমান বিপর্যয়কে কাটিয়ে ওঠার শক্তি রাখে। রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রের জয়ের কথা লিখেছিলেন *রাশিয়ার চিঠিতে*। ষাট বছরের সমাজতন্ত্র নির্মাণ ও তাকে রক্ষা করার লড়াইয়ের পর সোভিয়েত ইউনিয়নই ভেঙে যায়। এই ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারে রাশিয়ার যৌবনশক্তি লিপ্ত হয়েছে এবং এই ব্যাপারটি লেখকের ভাষায় ছিল অপ্রত্যাশিত। এই পতনের কারণ হিসেবে লেখক বলেন, রাশিয়ার তরুণ-তরুণীদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভোগবাদ পেয়ে বসেছে। তরুণদের একটি অংশই মার্কস ও লেনিনকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবরকম কৃচ্ছ্রতার জন্য দায়ী করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পত্তন ঘটায়। রণেশ দাশগুপ্ত সাম্যবাদী সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে আশাবাদী হয়ে বলেন– ইতিহাসের চাকা ভোগবাদের পাল্লায় পড়ে পিছনের দিকে ঘুরবে না এটাই প্রত্যাশা করা যায়। এই প্রত্যাশার ভিত্তি রয়েছে।[২৮]

রণেশ দাশগুপ্তের সমাজভাবনায় মার্কসবাদ, মানবতাবাদ ও গণমানুষের মুক্তির আদর্শিক প্রত্যয় অঙ্গীকার হিসেবে কাজ করেছে। সমাজমানসের সর্বজনীন মুক্তির চিন্তা তাঁকে বিশ্বসাহিত্যের বিস্তৃত দুয়ারে নিয়ে গেছে এবং তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষিত থেকে সর্বমানবিকতাকে জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি সাহিত্যকে সমাজ নির্মাণের বৈশ্বিক ও সমাজবাদী ধারার সাথে যুক্ত করেছেন। রণেশ দাশগুপ্ত সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনাকে পাশ কাটিয়ে সাহিত্য-সমালোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর সমালোচনায় উপযোগবাদ প্রাধান্য পেয়েছে, তবে তিনি সাহিত্যের সৌন্দর্যের দিককেও অস্বীকার করেন না।

মার্কসবাদ রণেশ দাশগুপ্তের আদর্শ ও প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে জীবনভর। সাহিত্য রচনার চাইতে রাজনৈতিক চিন্তক এবং কর্মী হিসেবে নিজের কর্মধারাকে ব্যাপৃত রেখেছেন তিনি। ব্যক্তিগত চিন্তা ও দর্শনকে বজায় রাখতে গিয়ে মার্কসবাদী সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতেও দ্বিধা করেননি তিনি। সাহিত্যিকের জীবনবোধ, কর্ম ও সৃষ্টিকে আয়ত দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে সাহিত্যের সামগ্রিক রূপের কথা তিনি বলেন। রণেশ দাশগুপ্ত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে তাঁর মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এক্ষেত্রে সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের চিন্তাকে সাহিত্যের ভেতরে খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় তিনি সাহিত্যের ভেতরে নিজের আদর্শকে চাপিয়ে দিচ্ছেন বলে পাঠকের মনে প্রশ্ন তৈরি হওয়াও অসঙ্গত নয়। রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধের সমাজচিন্তা আরোপিত নয়, শিল্পী-সাহিত্যিকের চিন্তার স্বাধীনতাকে তিনি স্বীকার করেন। মার্কসবাদের পতন ঘটলে রণেশ দাশগুপ্ত আশাহত না হয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিজের চিন্তাকে আবারও প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে লেখনী ধারণ করেন। অতীত ও বর্তমানের সাহিত্য ঘেঁটে তিনি সাম্যবাদী সমাজ পুনঃ নির্মাণের আশা ব্যক্ত করেন। একুশ শতকের সংগ্রামী পাঠকের অনুপ্রেরণা ও স্বস্তির জায়গা রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ।

তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), *রণেশ দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী,২০০২), পৃ. ২৬৫

২. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদক), *বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪১৭), পৃ. ২৩৭

৩. আহমদ শরীফ, *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ১৯১

৪. বদরুদ্দীন উমর, *মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৮), পৃ.৩৭

৫. তদেব, পৃ. ৪৬

৬. তদেব, পৃ. ৩৯

৭. রণেশ দাশগুপ্ত, *রণেশ দাশগুপ্ত রচনাসমগ্র ১ম খণ্ড*, সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত, (ঢাকা: বাংলা প্রকাডেমি, ২০১২), পৃ. ৪

৮. তদেব, পৃ. ১৫৪

৯. তদেব, পৃ. ২৯৫

১০. তদেব, পৃ. ১১৯

১১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৭), পৃ. ৩৮

১২. আহমদ ছফা, *আহমদ ছফা রচনাবলি ৪র্থ খণ্ড*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, (ঢাকা: খান ব্রাদার্স, ২০১৮), পৃ. ১৪৪

১৩. রণেশ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৭

১৪. তদেব, পৃ. ১৯৭

১৫. তদেব, পৃ. ২২৩

১৬. তদেব, পৃ. ২৩৯

১৭. তদেব, পৃ. ২৪৯

১৮. তদেব, পৃ. ২৪৯

১৯. তদেব, পৃ. ৫১৬

২০. তদেব, পৃ. ৫১৯

২১. তদেব, পৃ. ৫২৫

২২. তদেব, পৃ. ২৫৮

২৩. তদেব, পৃ. ২৫৯

২৪. তদেব, পৃ. ৪৬৫

২৫. তদেব, পৃ. ৩৪৬

২৬. তদেব, পৃ. ৩৭০

২৭. রণেশ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪

Jagannath University Journal of Arts
Volume 14, No 01, January-June 2024

Autonomous English language learning during covid-19: Learners' perceptions, involvement, and challenges

Md. Abdur Rouf[*]
Md. Abdus Salam[**]

Abstract

The study reported here targeted to explore the English language learners' (ELLs) perceptions of and involvement in autonomous learning along with the challenges they faced during the COVID-19 pandemic in Bangladesh. The devastating pandemic has entirely transposed the outlook of traditional teaching-learning, and teachers as well as learners across the world have been forced to explore different alternatives to in-person teaching-learning. Autonomous learning (AL) could be an effective way for addressing the ELL's learning difficulties during the pandemic. Using the quantitative approach, data were collected from one hundred-nine undergraduate and postgraduate ELLs of a public university in Bangladesh. The major findings included no consequential variances among Bangladeshi autonomous English language learners in terms of gender, merit, age, and urban and rural locations. Bangladeshi autonomous English language learners' perceptions during COVID-19 were satisfactory and they found autonomous English language learning beneficial during the pandemic. In addition, they mentioned that the existing syllabuses and curriculum, lack of training and instruction, academic culture, and unstable internet facilities as the key challenges of autonomous English language learning. The researchers suggest including self-directed English language learning in the curriculum and syllabus. The article also makes some recommendations for the stakeholder after discussing the implications of the major findings.

Keywords: autonomous learning, English language, COVID-19, ELL, learners' perceptions, involvement, and challenges

Introduction

In the teaching of English as a second language, the idea of autonomous learning (AL) has received a lot of attention (Benson, 2007; Smith, 2007). Learner autonomy, according to Holec (1981), is "the capacity to direct one's own learning" (as cited in Neupane, 2010, p. 3). Although there is no universally accepted definition of AL, learners' greater role in their own learning is the main focus. In AL, a lot of the decisions about the student's education are made by them. Many scholars agree that AL is a process, not an end in itself. Sometimes, it is assumed that teachers do not play any role in AL. However, the fact is that AL is most often guided and prompted by teachers (Smith, 2007). Learners try to develop their individual pathways of learning according to their preferred styles and strategies with help from their

[*]Associate Professor, Department of English, Jagannath University, Dhaka
[**] Professor, Department of English, Jagannath University, Dhaka

teachers and peers. On a different level, AL is very much related to the idea of lifelong learning (Benson, 2007). As teachers scaffold learners towards AL, learners develop the much-desired potential of being interdependent lifelong learners. Moreover, one needs to be very careful about the cultural aspects of learner autonomy. Usually, it is assumed that in a collectivist society, it is difficult to practise learner autonomy (Holliday, 2007). Learner autonomy has also been asserted to be a cross-culturally applicable educational objective (Smith, 2007).

Bangladesh has been severely impacted by the deadly corona virus, like the majority of other nations worldwide (Al-Zaman, 2020). Consequently, all types of educational institutions in Bangladesh postponed in-person classes since March 18, 2020 (Ela et al., 2021). As the pandemic took a worse turn, and in-person teaching-learning seemed a distant possibility, and most of the tertiary-level educational institutions in Bangladesh started online classes in July 2020. However, many of the ELLs failed to attend online classes due to device inaccessibility and other factors (Baxter, 2020), and the overall effectiveness of online classes has become a contentious issue. Besides, after teaching online for two semesters, English language teachers had to postpone online classes as most educational institutions could not arrange online tests for their learners. In this context, Rouf and Mohamed (2018) found that the majority of EFL teachers possessed fundamental technological abilities. So, given the present realities, the ELLs could opt for AL with the help of their teachers. In this context, the current study examined how ELLs perceived autonomous learning, how they participated in it, and the difficulties they encountered.

This paper is organised into six main segments. The first part introduces the topic of the study and specifies its focus. A brief summary of the pertinent literature on autonomous learning is presented in the second section. The study's research design is discussed in the third section. The study's findings and a succinct analysis of them are presented in the fourth and fifth portions, respectively. The report concludes by highlighting the significance of the key findings and outlining some suggestions for the stakeholders involved.

Conceptual Framework: Different Aspects of Autonomous Learning

Holec (1981) delimitates autonomous learning as a learner's *ability* to deal with one's learning in his or her own efforts while Sinclair (2008) avows that it rests on the pupil's *willingness* and integrates "meta-cognitive knowledge of learning context and the process of learning" (cited in Lamb & Reinders, 2008, p. 1). On the opposite side of the coin, Scharle & Szabo (2000) report that students' 'responsibility' along with 'cultural attitudes' are interconnected towards the favorable outcome of autonomous learning. Alike Holec and Sinclair, another linguist William Littlewood (1996) focuses on two prime constituents of autonomous learning which are 'ability' and 'willingness'. According to Littlewood (1996), "we can define an autonomous person as one who has an independent capacity to make and carry out the choices

which govern his or her actions"(p. 428). Similarly, Dam (1995) delineates autonomous learning at different non-identical phraseology of 'ability' as 'capacity' as well as 'willingness' in terms of the learner's necessities. He remarks:

> The ability to direct one's own learning in support of personal needs and goals defines autonomous learning. Such kind of capacity and willingness to act independently call for the success as a socially responsible person. (p. 1)

Hence, Dam puts stress on pupils' needs together with purposes or goals and objectives. Dickinson (1992) defines autonomous learning as "…an attitude towards learning in which the learner is prepared to take responsibility for his own learning" (p. 330). Each student has ability plus willingness, yet successful learners understand how to avail themselves of this aptness including knowledge expectantly to learn and understand independently. Regarding the scenario, Wenden (1991) claims:

> Successful or expert or intelligent learners have learned how to learn. Successively, they acquire independent learning strategies and knowledge about learning. Such positive attitudes enable them to use these skills and knowledge confidently. Next time, learners become independent and autonomous. (p. 15)

Recently, Krzanowski (2017) declares that extent of cognition might be different from the level of the learner. He further locates autonomous learning in alternative wordings "Learner independence is a student's ability, innate or acquired, to function autonomously or semi-autonomously in an ELT classroom while taking judicious control and responsibility for their own language progress and development" (p. 2). Additionally, he points out that autonomous learning may be appraised regarding pupils' language learning as well as in the field of general education like cooking and painting, etc.

Review of Literature

Borg & Al-Busaidi (2012) claim, AL "improves the quality of language learning, promotes democratic societies, prepares individuals for life-long learning, that it is a human right, and that it allows learners to make best use of learning opportunities in and out of the classroom" (p. 2). Thus, autonomous learning is supportive of language learning as in learner autonomy students perceive how to learn as well as how to get hold of control of their self-learning. But they speak for language learning in general whereas the researchers try to investigate autonomous English language learning.

From a similar standpoint, Byram and Hu (2013) ascertain that independent pupils understand the way in which they enlarge the intended learning plan. They can also verify strength as well as feebleness as students; can chart relevant independent methodology at relatively self-choice; can get better control of distinctive bars for acquiring something. Once more, Byram and Hu (2013) adjoin several imperatives e.g., contextual apprehension regarding the independent studying method, meta-

language, and confident outlook to flourish autonomous learning as a triumphant studying approach. Byram and Hu, (2013) argue that autonomous learning is accommodating for pupils that are self-guided plus stimulated in acquiring a new thing in a free-spirited approach. This study tries to pinpoint those benefits in relation to ELL and teaching. However, autonomous learning might be time-consuming in some circumstances (Rubin, 1981). This situation makes language learners frustrated and stressed. So, the stressful situation might affect language learning as mentioned by Krashen in his Affective Filter Hypothesis (1981). Within this framework, autonomous English learning will be the next foremost auto-learning approach for English language learning and teaching. Again, the auto-learning approach is quite similar to Stephen Krashen's natural approach (1982) to second or foreign language learning. Similarly, ALL was found to be helpful for creating language learning techniques in the setting of Bangkok, Thailand, by Iamudom and Tangkiengsirisin (2020).The researchers explain that autonomous learning becomes beneficial for students when teachers encourage such kind of independent learning. The instructor might create a consciousness that reading materials collected outside the classroom and without others' help may be helpful for learning. In addition, instructors may dictate that authentic materials like online and hard copies of newspapers, all kinds of dictionaries i.e., general, linguistic, collocation dictionaries, etc., investigative journals, television programs, documentaries, BBC Radio and Television broadcasting, cartoons, movies, reality shows, etc. on target language are the high-yielding wellspring of studying a second or foreign language in the autonomous endeavor (Krzanowski, 2017).

Often, it has been argued that AL is only appropriate and applicable to Western academic cultures as it is grounded in Western learning and teaching tradition. This shape of pre-occupied ethnic and cultural generalisation becomes dangerous for autonomous learning. Autonomous learning is relevant and fitting for all learning and teaching pedagogy (Palfreyman& Smith, 2003).

To summarise, autonomous language learning opens a new opening in language learning, and simultaneously, it has become a contentious field in academia. Reviewing the plethora of literature on autonomous language learning, the authors find that autonomous English language learning has emerged as an important field of research during COVID-19, and it reflects students' cognitive intelligence, positive attitude as well as the academic culture of a certain location. To the best of our knowledge, not many studies on AL have been done in Bangladesh. In light of this, the following research questions served as the basis for the current study:

i) What did the students think of learning English independently during COVID-19?
ii) How did students involve themselves in autonomous English language learning during COVID-19?
iii) What were the challenges of learning the English language autonomously during COVID-19?

Research Methodology

Research Approach

This article applied quantitative data analysis methods to critically investigate the learners' perceptions, involvement, and challenges of autonomous ELL during COVID-19.

Context and Participants

The setting for this study's execution was a prominent public university. Following "stratified sampling that divides the target population into groups or strata," samples were chosen (Biggam, 2015, p. 133). Each responder had an equal chance of being included in the sample when they completed a survey through email using a Google Form. 109 undergraduate and graduate students took part in the survey, responding to the questionnaire.

Data Collection Tools and Methods

A questionnaire was developed to investigate learners' perceptions, involvement, and challenges of autonomous English language learning at the undergraduate and post-graduate level in Bangladesh during the COVID-19 pandemic. The 52 items, including the demographic ones, were chosen following a thorough assessment of the pertinent literature. The table below shows the breakdown of the questionnaire items.

Table 1
Break down of the questionnaire items

Constructs	Items
Demographic Profile	Question numbers 1 to 5
Perceptions (objective 1)	Questions 6 through 17
Involvement (objective 2)	Question numbers 18 to 32
Challenges (objective 3)	Question numbers 33 to 52

Consequently, the questionnaire was administered among students to collect empirical data on the targeted issues.

The Approach to Data Analysis

With the aid of computer software called the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 23, the collected data were analyzed in accordance with the goals of the current study by using various statistical techniques like the independent sample *t*-test, one-way ANOVA, and correlation coefficients.

Results

The key findings of the study are presented below.

Table 2

*Independent Sample t-*test *Between Male and Female in terms of their Perceptions of Autonomous ELL during COVID-19*

Sex	N	M	SD	T	sig.
Male	47	46.13	6.05	-.57	.57
Female	62	46.68	4.10		

P > .0 5

The above Table indicates that the mean scores of both the males (*M* = 46.13; *SD* = 6.05) and females (*M* = 46.68; *SD* = 4.10) are approximately the same in terms of their perceptions of autonomous ELL during COVID-19.So, there is no significant difference (*t* = -.57; *p* > .05) between males and females in terms of their perceptions of autonomous ELL during COVID-19.

Table 3

*Independent Sample t-*test *Between Males and Females in terms of their Involvement in Autonomous ELL during COVID-19*

Sex	N	M	SD	T	sig.
Male	47	59.09	6.66	-.06	.06
Female	62	59.16	6.43		

P > .0 5

The above Table indicates that the mean scores of both the male (*M* = 59.09; *SD* = 6.66) and females (*M* = 59.16; *SD* = 6.43) are approximately the same in terms of their involvement in autonomous ELL during COVID-19. So, there is no significant difference (*t* = -.06; *p* > .05) between males and females in terms of their involvement in autonomous ELL during COVID-19.

Table 4

*Independent Sample t-*test *Between Male and Female in terms of their Challenges of Autonomous ELL during COVID-19*

Sex	N	M	SD	T	sig.
Male	47	61.30	11.16	-.37	.37
Female	62	62.10	11.38		

P > .0 5

The above table indicates that the mean scores of both the males (*M* = 61.30; *SD* = 11.16) and females (*M* = 62.10; *SD* = 11.38) are approximately same in terms of their challenges of autonomous ELL during COVID-19. So, there is no significant difference (*t* = -.37; *p* > .05) between male and female in terms of their challenges of autonomous ELL during COVID-19.

Table 5
Independent Sample t-test *Between Urban and Rural in terms of their Perceptions of Autonomous ELL during COVID-19*

Area	N	M	SD	T	sig.
Urban	54	46.67	4.79	.47	.47
Rural	55	46.22	5.26		

P > .0 5

The above Table indicates that the mean scores of both the urban (*M* = 46.67; *SD* = 4.79) and rural (*M* = 46.22; *SD* = 5.26) are approximately same in terms of their perceptions of autonomous ELL duringCOVID-19. So, there is no significant difference (*t* = .46; *p* > .05) between urban and rural in terms of their perceptions of autonomous ELL during COVID-19.

Table 6
Independent Sample t-test *Between Urban and Rural in terms of their Involvement in Autonomous ELL during COVID-19*

Area	N	M	SD	t	sig.
Urban	54	60.43	6.70	2.10	2.10
Rural	55	57.85	6.09		

P > .0 5

The above table indicates that the mean scores of both the urban (*M* = 60.43; *SD* = 6.70) and rural (*M* = 57.85; *SD* = 6.09) are approximately the same in terms of their involvement in autonomous ELL during COVID-19. So, there is no significant difference (*t* = 2.10; *p* > .05) between urban and rural in terms of their involvement in autonomous ELL during COVID-19.

Table 7
Independent Sample t-test *Between Urban and Rural in terms of their Challenges of Autonomous ELL during COVID-19*

Area	N	M	SD	t	sig.
Urban	54	63.96	11.57	2.07	2.07
Rural	55	59.58	10.57		

P > .0 5

The above Table indicates that the mean scores of both the urban (*M* = 63.96; *SD* = 11.57) and rural (*M* = 59.58; *SD* = 10.57) are approximately the same in terms of their challenges of autonomous ELL during COVID-19. So, there is no significant difference (*t* = 2.07; *p* > .05) between urban and rural in terms of their challenges of autonomous ELL during COVID-19.

Table 8
Mean and standard deviation of learning perceptions of different age groups of undergraduate and graduate students regarding *autonomous ELL during the COVID-19 situation*

Name of Variable	Level of Age	N	Mean	SD
Age	From 15-25	86	46.29	5.15
	From 26-35	19	46.84	4.89
	From 36-45	3	48.33	3.06
	Above 45	1	46.00	-
Total		109		

The above Table indicates that the means of the four age groups are approximately the same. The highest mean (M = 48.33; SD = 3.06) belongs to the age group 36-45 while the lowest mean belongs to the age group above 45 (M = 46).

Table 9
Analysis of variance of learning perceptions of different age groups of undergraduate and graduate students regarding autonomous ELL during the COVID-19 situation

Name of Variable	Source of Variation	SS	df	MS	F	Sig.
Age	Between groups	15.94	3	5.312	.207	.892
	Within groups	2700.93	105	25.72		
	Total	2716.86	108			

P>.05

ANOVA Table reports that there is no significant ($F_{3, 105}$= .207; p> .05) difference among the age group of undergraduate and graduate students in terms of their learning perceptions regarding autonomous ELL during the COVID-19 situation.

Table 10
Mean and standard deviation of learning involvement of different age groups of undergraduate and graduate students in autonomous ELL during the COVID-19 pandemic

Name of Variable	Level of Age	N	Mean	SD
Age	From 15-25	86	58.47	6.91
	From 26-35	19	61.84	4.06
	From 36-45	3	60.67	3.06
	Above 45	1	60.00	-
Total		109		

The above Table indicates that the means of four age groups are approximately same. The highest mean (*M* = 61.84; *SD* = 4.06) belongs to age group 26-35 while the lowest mean belongs to age group 15-25 (*M* = 58.47).

Table 11

Analysis of variance of learning involvement of different age groups of undergraduate and graduate students in autonomous ELL during the COVID-19 situation

Name of Variable	Source of Variation	SS	Df	MS	F	Sig.
Age	Between groups	185.61	3	5.312	1.484	.223
	Within groups	4376.59	105	25.72		
	Total	4562.20	108			

P>.05

ANOVA Table reports that there is no significant ($F_{3, 105}$= 1.484; *p*> .05) difference among the age groups of undergraduate and graduate students in terms of their learning involvement in autonomous ELL during the COVID-19 situation.

Table 12

Mean and standard deviation of learning challenges of different age groups of undergraduate and graduate students regarding autonomous ELL during the COVID-19 situation

Name of Variable	Level of Age	N	Mean	SD
Age	From 15-25	86	61.42	12.07
	From 26-35	19	62.74	8.02
	From 36-45	3	64.33	5.69
	Above 45	1	64.00	-
Total		109		

The above Table indicates that the means of four age groups are approximately same. The highest mean (*M* = 64.33; *SD* = 5.69) belongs to age group36-45 while the lowest mean belongs to age group15-25 (*M* = 61.42).

Table 13

Analysis of variance of learning challenges of different age groups of undergraduate and graduate students regarding autonomous ELL during the COVID-19 situation

Name of Variable	**Source of Variation**	**SS**	**Df**	**MS**	**F**	**Sig.**
Age	Between groups	53.03	3	5.312	.138	.938
	Within groups	13597.28	105	25.72		
	Total	13650.31	108			

P>.05

ANOVA Table reports that there is no significant ($F_{3, 105}$= .138; p> .05) difference among the age groups of undergraduate and graduate students in terms of their learning challenges of autonomous ELL during the COVID-19 situation.

Table 14

Mean and standard deviation of learning perceptions of different merit groups of undergraduate and graduate students regarding autonomous ELL during the COVID-19 situation

Name of Variable	Level of Merit	N	Mean	SD
	A- (Minus)	20	47.10	3.68
	A (Only)	54	46.46	4.75
Merit	A+ (Plus)	28	46.54	6.51
	B (Only)	7	44.00	3.42
	C (Only)	-	-	-
	D (Only)	-	-	-
Total		109		

The above Table indicates that the means of the six merit groups are approximately the same. The highest mean (M = 47.10; SD = 3.68) belongs to merit group A- (Minus) while the lowest mean belongs to merit group B (M = 44.00).

Table 15

Analysis of variance of learning perceptions of different merit groups of undergraduate and graduate students regarding autonomous ELL during the COVID-19 situation

Name of Variable	Source of Variation	SS	Df	MS	F	Sig.
	Between groups	50.67	3	16.89		
Merit	Within groups	2666.19	105	25.39	.665	.575
	Total	2716.86	108			

P >.05

ANOVA Table reports that there is no significant ($F_{3, 105}$ = . 665; p > .05) difference among the merit groups of undergraduate and graduate students in terms of their learning perceptions of autonomous ELL during the COVID-19 situation.

Table 16

Mean and standard deviation of learning involvement of different merit groups of undergraduate and graduate students in autonomous ELL during the COVID-19 situation

Name of Variable	Level of Merit	N	Mean	SD
	A- (Minus)	20	59.60	4.67
	A (Only)	54	58.33	5.55
Merit	A+ (Plus)	28	60.96	9.14

Name of Variable	Level of Merit	N	Mean	SD
	B (Only)	7	56.57	3.74
	C (Only)	-	-	-
	D (Only)	-	-	-
Total		109		

The above Table indicates that the means of the six merit groups are approximately the same. The highest mean (M = 60.96; SD = 9.14) belongs to merit group A+ (Plus) while the lowest mean belongs to merit group B (M = 56.57).

Table 17

Analysis of variance of learning involvement of different merit groups of undergraduate and graduate students in autonomous ELL during the COVID-19 situation

Name of Variable	Source of Variation	SS	Df	MS	F	Sig.
Merit	Between groups	178.72	3	59.57	1.427	.239
	Within groups	4383.48	105	41.75		
	Total	4562.20	108			

P >.05

ANOVA Table reports that there is no significant ($F_{3, 105} = 1.427$; $p > .05$) difference among the merit groups of undergraduate and graduate students in terms of their learning involvement in autonomous ELL during the COVID-19 pandemic.

Table 18

Mean and standard deviation of learning challenges of different merit groups of undergraduate and graduate students regarding autonomous ELL during the COVID-19 situation

Name of Variable	Level of Merit	N	Mean	SD
	A- (Minus)	20	61.30	9.12
	A (Only)	54	63.15	9.02
Merit	A+ (Plus)	28	60.43	15.66
	B (Only)	7	57.57	11.72
	C (Only)	-	-	-
	D (Only)	-	-	-
Total		109		

The above Table indicates that the mean of the six merit groups is approximately the same. The highest mean (M = 63.15; SD = 9.02) belongs to merit group A (only) while the lowest mean belongs to merit group B (M = 57.57).

Table 19

Analysis of variance of learning challenges of different merit groups of undergraduate and graduate students regarding autonomous ELL during the COVID-19 situation

Name of Variable	Source of Variation	SS	Df	MS	F	Sig.
Merit	Between groups	280.73	3	93.58	.735	.533
	Within groups	13369.59	105	127.33		
	Total	13650.31	108			

P >.05

ANOVA Table reports that there is no significant ($F_{3, 105} = .735$; $p > .05$) difference among the merit groups of undergraduate and graduate students in terms of their learning challenges of autonomous ELL during the COVID-19 situation.

Item Wise Percentage Data

Item wise percentage data are presented in the following tables:

Table 20

Participants' Demographic Profile

Statements	Answer Choices in Percentage					
1. I am:	Male (43.1%)			Female (56.9%)		
2. My age (in years):	15-25 (78.9%)	26-35(17.4%)		36-45(2.8%)	More than 45 (0.9%)	
3. I am from:	Rural (49.5%)			Urban (50.5%)		
4. My HSC GPA in English was:	A+ (25.7 %)	A (49.5%)	A- (18.3%)	B (6.4%)	C (0.00%)	D (6.4%)
5. My active email:						

n = 109

Table 21

Participants' Perceptions of Autonomous/Independent Learning

Statements	Answer Choices				
	Strongly agree (%)	Agree (%)	I don't know (%)	Disagree (%)	Strongly disagree (%)
6. Autonomous/independent learning is about taking charge of learners' own learning.	22	55	12.8	9.2	0.9
7. In autonomous learning, learners do not need a teacher.	7.3	30.3	13.8	45.9	2.8
8. Learners can select their resources for language learning.	18.3	66.1	4.6	10.1	0.1
9. Learners are encouraged to develop their own learning styles and strategies.	25.7	69.7	0.9	2.8	0.9

Statements	Answer Choices				
	Strongly agree (%)	Agree (%)	I don't know (%)	Disagree (%)	Strongly disagree (%)
10. Learners can identify their language needs, and set learning goals/objectives accordingly.	18.3	63.3	7.3	8.3	2.8
11. Learners will be involved in discovery and investigation learning.	21.1	64.2	10.1	4.6	0.0
12. Learners will be motivated to learn independently.	32.1	58.7	3.7	4.6	0.9
13. Learners can monitor/assess their own learning progress-identifying strengths and weaknesses in language learning.	22.9	56.9	5.5	12.8	1.8
14. Learner autonomy is a western idea, and it works only in western countries.	3.7	17.4	21.1	48.6	9.2
15. Learner autonomy means working independently in cooperation with teachers and other learners.	21.1	61.5	8.3	8.3	0.9
16. Learners are highly encouraged to reflect on their own learning.	18.3	67.9	6.4	7.3	0.0
17. Autonomous learning helps become lifelong learners.	34.9	51.4	9.2	2.8	1.8

n = 109

Table 22

Participants' Involvement in Autonomous Learning/Learning Practices

Statements	Answer Choices				
	Strongly agree (%)	Agree (%)	I don't know (%)	Disagree (%)	Strongly disagree (%)
18. I make all the decisions regarding my English language learning.	11	61.5	3.7	23.9	0.0
19. I identify my needs, and set goals and objectives accordingly for language learning.	18.3	60.6	5.5	14.7	0.9
20. I find out study materials/ resources for learning English independently.	14.7	66.1	3.7	14.7	0.9
21. I have my own language learning strategies.	16.5	71.6	3.7	8.3	0.0
22. I ask for teachers'	26.6	67	2.8	3.7	0.0

Statements	**Answer Choices**				
	Strongly agree (%)	**Agree (%)**	**I don't know (%)**	**Disagree (%)**	**Strongly disagree (%)**
and peers' assistance when needed.					
23. I am motivated by autonomous language learning.	14.7	73.4	4.6	6.4	0.9
24. I use English to learn the language.	19.3	75.2	0.9	4.6	0.0
25. I play an active role in online classes during COVID-19.	28.4	59.6	0.9	8.3	2.8
26. I watch English movies, news, and YouTube.	33.9	61.5	0.0	4.6	0.0
27. I read books, magazines, and newspapers in English.	22	63.3	1.8	11	1.8
28. I listen to audio-books and songs in English.	18.3	58.7	0.0	21.1	1.8
29. I use language learning apps, blogs, and websites.	12.8	56.9	2.8	24.8	2.8
30. I use dictionaries to find out the meanings of new words.	50.5	47.7	0.9	0.9	0.0
31. I do self-assessment/peer assessment of my learning.	18.3	64.2	5.5	11	0.9
32. I reflect on my English language learning.	16.5	70.6	8.3	3.7	0.9

n = 109

Table 23

Participants' Challenges of Autonomous Learning

Statements	**Answer Choices**				
	Strongly agree (%)	**Agree (%)**	**I don't know (%)**	**Disagree (%)**	**Strongly disagree (%)**
33. I have no previous experience with autonomous learning.	8.3	46.8	8.3	33.9	2.8
34. I do not know how	5.5	35.8	5.5	50.5	2.8

Statements	Answer Choices				
	Strongly agree (%)	**Agree (%)**	**I don't know (%)**	**Disagree (%)**	**Strongly disagree (%)**
to reflect on self-learning.					
35. I am not a proactive EL learner.	5.5	45	13.8	33.9	1.8
36. I am very much dependent on my teachers for learning English.	7.3	23.9	9.2	53.2	6.4
37. I cannot practice English outside the classroom.	1.8	28.4	0.9	56.9	11.9
38. Autonomous learning is a western idea. It won't work in Bangladesh.	1.8	12.8	15.6	53.2	16.5
39. Our syllabuses and textbooks do not support autonomous learning.	11.9	45	13.8	29.4	0.0
40. I am interested only in passing the English exams with good grades.	6.4	12.8	2.8	49.5	28.4
41. I cannot select study materials/ resources for language learning.	7.3	20.2	4.6	65.1	2.8
42. I do not have the motivation/interest in autonomous learning.	4.6	18.3	5.5	65.1	6.4
43. I cannot manage the workload and stress involved in autonomous learning.	4.6	28.4	11.9	52.3	2.8
44. I have never tried to be an autonomous learner.	3.7	22.9	4.6	62.4	6.4
45. I do not know the strategies for being an autonomous learner.	3.7	38.5	11	44	2.8
46. I do not get support from my teachers and peers to be an autonomous learner.	5.5	17.4	6.4	61.5	9.2
47. I do not have the confidence to be an autonomous learner.	4.6	20.2	7.3	58.7	9.2

Statements	Answer Choices				
	Strongly agree (%)	**Agree (%)**	**I don't know (%)**	**Disagree (%)**	**Strongly disagree (%)**
48. I do not know how to assess/evaluate my learning and my peers' learning.	5.5	29.4	7.3	53.2	4.6
49. In online teaching teachers are following a teacher-centered approach.	13.8	44	15.6	25.7	0.9
50. I cannot decide my learning needs, goals, and objectives.	6.4	28.4	3.7	54.1	7.3
51. I received no training/guidelines for autonomous learning.	16.5	56	7.3	19.3	0.9
52. Unstable internet connections negatively affect autonomous learning.	32.1	56.9	6.4	3.7	0.9

n = 109

Discussion

The researchers observe that both males and females are conscious of autonomous English language learning. According to the SPSS t-test (Table 1), this study finds that there is no significant difference between male and female participants' perceptions of autonomous English language learning. The researchers earlier assumed that there might be a difference between male and female participants' perceptions. This may happen for many reasons i.e., at present, male and female students are getting the same facilities from an academic institution, family, and society. Once upon a time, female students were confined to their homes. But for the initiatives taken by the government, females in Bangladesh are now getting educated and employed in different sectors. Secondly, once upon a time, the number of child marriages was high. That situation has also changed in Bangladesh. Thirdly, the economic status of Bangladesh has changed for the better so both females and males can afford education. Finally, for economic development, most children are getting nutritious foods, and they are growing up as meritorious students. For the above reasons, the researchers think that male and female students' perceptions, involvement, and challenges of autonomous English language learning during COVID-19 in Bangladesh do not indicate significant differences.

This study finds that both urban and rural participants have similar perceptions of autonomous English language learning. To begin with, the researchers think that for the development of the education sector in Bangladesh, learners both from urban and

rural areas can access education in schools and colleges. Besides, with the development of mobile technology and internet facilities, anybody can access educational tools from anywhere in Bangladesh. Thirdly, for economic development, maximum learners both from urban and rural can purchase a mobile phone and search on Google to learn according to their necessities. Lastly, educated parents are nowadays very much concerned about the education of their children both from urban and rural areas. For these reasons, the perceptions and involvements of urban and rural learners in autonomous ELL are not significantly different.

This study was conducted in four age groups i.e., 15-25 years, 26-35 years, 36-45 years, and more than 45 years, and finds that in the case of learners' perceptions, involvement, and challenges, there are no significant differences. The researchers noticed that 86 participants are from the 15-25 years age group. Firstly, for the language learning policy of Bangladesh, learners of all ages are enthusiastic to learn language autonomously. Secondly, for the economic development of Bangladesh, learners of all ages can afford to buy smart phones and avail internet facilities from home. Then, online materials are available in plenty with which they can learn language autonomously. Fourthly, Bangladeshi learners are now trying to have an education abroad, especially from English-speaking countries. Also, many learners want to obtain immigration facilities in English-speaking countries. So, learners of all ages have quite similar perceptions, involvement, and challenges of autonomous English language learning situations in Bangladesh.

Conclusion and Recommendations

Based on the discussion posed earlier, it can be concluded that for Bangladeshi academic culture, autonomous English language learning is a new approach as it is not included in syllabuses and curricula. The researchers find that most of the participants are enthusiastic to take responsibility for their own English language learning. They are eager to select their study materials; identify their goals and objectives; develop their own English language learning styles and strategies; monitor and assess their own English language learning and want to be life-long learners by autonomous English language learning. Most of the participants do not believe that teachers and instructors are not necessary for autonomous English language learning. They also do not believe that autonomous English language learning is a western idea and cannot work in Bangladesh.

Secondly, when Bangladeshi English language learners were involved in English language learning during COVID-19, the majority of them found that they can make their own decision for their English language learning, identify their needs, and discover their styles; can ask their teachers and peers for instructions; can use the target language in learning it; can play an active role in distant learning platform like online classes. Most of the participants can watch movies, news, and videos; can read books, magazines, and newspapers; can listen to audio-books and songs, and

can use apps, blogs, and websites in the target language anytime anywhere outside regular classes during COVID-19 in Bangladesh. Most of them are motivated and can assess their own English language learning. In Bangladeshi academic realities, speaking and listening skills are not practised properly in classrooms. In an autonomous English language learning scenario, all four skills of the English language can be practised and learned confidently by self-confident learners. Overall, the autonomous English language learning practices in Bangladesh during COVID-19 were beneficial for Bangladeshi English language learners. Finally, most of the participants have mentioned a few challenges of autonomous English language learning. Lack of training and instructions, syllabuses and curriculum, unstable internet, and academic culture are the challenges of autonomous English language learning during COVID-19 in Bangladesh.

Based on the key findings on the participants' perceptions, involvement, and challenges of autonomous English language learning during COVID-19 in Bangladesh, the researchers recommend updating the syllabuses and curriculum, arranging proper training both for learners and teachers, and making online recourses available for all. In addition, the curriculum and syllabus designers can encourage all males and females, urban and rural, meritorious, and less meritorious as well as young and adult learners to develop an AL approach for learning the English language. The researchers also recommend further in-depth studies on different unexplored aspects of autonomous English language learning in Bangladesh.

References

Al-Zaman, M. S. (2020). Healthcare crisis in Bangladesh during the COVID-19 Pandemic. *Am J Trop Med Hyg, 103*(4), 1357-1359. doi:10.4269/ajtmh.20-0826

Baxter, M. (2020). Engaging adult English language learners in distance education: An ESL program's experience during the COVID-19 pandemic. *GATESOL Journal, 30*(1), 59-69.

Biggam, J. (2015). *Succeeding with your Master's Dissertation: A Step-by-Step Handbook: Step-by-step Handbook*. McGraw-Hill Education.

Benson, P. (2007). Autonomy in language teaching and learning. *Language Teaching, 40*(1), 21-40. doi:10.1017/S0261444806003958

Borg, S., & Al-Busaidi, S. (2012). Learner autonomy: English language teachers' beliefs and practices. *ELT Journal*, *12*(7), 1-45.

Byram, M. & Hu, A. (2013). *Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning*. Routledge.

Dam, L. (1995). *From Theory to Classroom Practice*. Authentik.

Dickinson, L. (1994). Learner autonomy: What, why, and how. *Autonomy in Language Learning*, 2-12.

Ela, M. Z., Shohel, T. A., Shovo, T. E., Khan, L., Jahan, N., Hossain, M. T., & Islam, M. N. (2021). Prolonged

lockdown and academic uncertainties in Bangladesh: A qualitative investigation during the COVID-19 pandemic. *Heliyon, 7*(2), 1-8. doi:10.1016/j.heliyon.2021.e06263

Holec, H. (1981). *Autonomy in Foreign Language Learning*, Oxford: Pergamon.

Holliday, A. (2007). Autonomy and cultural chauvinism. *Independence, 42*, 20-22.

Lamb, T., & Reinders, H. (Eds.). (2008). *Learner and Teacher Autonomy: Concepts, Realities, and Response* (Vol. 1). John Benjamins Publishing.

Iamudom, T., & Tangkiengsirisin, S. (2020). A Comparison study of learner autonomy and language learning strategies among Thai EFL Learners. *International Journal of Instruction, 13*(2), 199-212.

Krashen, S. (1981). *Second Language Acquisition and Second Language Learning*. Pergamon Press Inc.

Krzanowski, M. (2017). *Successful Learner Autonom /Learner Independence/ Self-Directed Learning*.

Lamb, T., & Reinders, H. (Eds.). (2008). *Learner and Teacher Autonomy: Concepts, Realities, and Responses*. John Benjamins.

Littlewood, W. (1996). "Autonomy": An anatomy and a framework. *System, 24*(4), 427-435.

Neupane, M. (2010). Learner autonomy: Concept and considerations. *Journal of NELTA,15*(1-2), 114-120.

Palfreyman, D., & Smith, R. C. (Eds.). (2003). *Learner Autonomy across Cultures*. Palgrave Macmillan.

Rouf, M., & Mohamed, A. R. (2018). Secondary school English language teachers' technological skills in

Bangladesh: A case study. *International Journal of Instruction*, *11*(4), 701-716.

Scharle, A., & Szabó, A. (2000). *Learner Autonomy* . Cambridge University Press.

Smith, R. (2007). Learner autonomy. *ELT Journal, 62*(4), 395-397. doi:10.1093/elt/ccn038

Wenden, A.L., 1991. *Learner strategies for learner autonomy: Planning and implementing learner training for language learner*s. Prentice-Hall.

Jagannath University Journal of Arts
Volume 14, No 01, January-June 2024

Poetic Crafts and Emotions : Bangabandhu in Shamsur Rahman's Poems

Dr. Md. Abu Zafor*

Abstract

Poetry is an art, a craft. Poets utilize various rhetorical and figurative devices to express their emotions in unique and powerful ways. Many Bangladeshi poets have written poems depicting Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who is inseparably linked with the freedom struggle and ultimate emergence of Bangladesh as an independent country in 1971. Shamsur Rahman, who is known as a 'Swadhinatar Kabi' (Poet of Independence) has written a number of poems weaving Bangabandhu, both directly and indirectly. This article aims to make an in-depth analysis of Rahman's poems concerning Bangabandhu. The discussion and interpretations show Bangabandhu's contributions on the one hand, and on the other,hisinevitablepresence and inspiration to the people of Bangladesh.

Keywords: Shamsur Rahman; Bangabandhu; poetry; emotion; craft

Poetry evokes emotion, and this emotion may be an outburst of the poet's mind. T.S. Eliot, however, warns that the 'emotion of art is impersonal', which means that the poet's personal emotion needs to be impersonalized (1098). The success of a piece of art depends on how encompassing the emotion is, as Rabindranath Tagore states in his essay 'Sahityer Bicharak' (652)– 'a poet's personal emotion should touch other minds similarly.' But how does a poet create such emotion in a poem? In his 1919 essay on Hamlet, T.S. Eliot has used the concept 'objective correlative'– a technique of creating images for a desired emotion without directly involving the subject (144-46). Again, as regards the craft of poetry Tagore says, 'the words of knowledge or information need to be proved, but the words of emotion need to be transmitted' (650). Therefore, the words of knowledge or information need to be direct and denotative while the words of emotion need to be oblique and connotative. As such, poets use language with a greater freedom, with a 'license', with suggestiveness and symbols (Abrams, Poetic License). They do this by webbing words in rhymes and meter; they utilize the figurative devices such as similes, metaphors, hyperboles and symbols and so on to enrich their language and evoke emotion and imagery. Figurative languages and music of poetry please our ear, our sensibility; this is the delighting aspect of poetry. The words of poetry can also convey us a message, a greater insight that may not be readily apparent in our day-to-day life. Poetry, thus, fills a gap between the tangible and the intangible, the visible and the invisible, between 'what is', and 'what should be.' Great poets are prophets, conscience of mankind. Being rooted to their respective society they may belong to the world.

Again, the subject of poetry can encompass anything because "poets are not tied to any subjection" (Sydney 330). Poets write out of their intense passions and emotions,

*Professor, Department of English, Jagannath University, Dhaka

out of a vision. They sing their joys and sorrows with which join the human beings wherever they may be. Poets often write out of a wound, a pain, that they experience from their social surroundings. For poets of Bangladesh such wounds are profound. Such wounds are intertwined with the birth of their homeland and its founding leader Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975) who is popularly known as Bangabandhu. It was Bangabandhu who fought for his people's freedom tirelessly, often like a fictional superman, enduring immense pains and sufferings, and successfully led them to achieve independence. But in post independent war-torn Bangladesh, under his leadership, when the country was slowly moving towards progress and prosperity, he along with his family members except his two daughters then residing abroad was tragically assassinated. This historical trauma has been the source of intense emotion for many poets of Bangladesh who are sensitive to their nation's history and struggle. They have weaved Bangabandhu in their verses, as one of the Bengali poets expresses his grief describing how a rose, a palash flower, a brick of Shaheed Minar and other objects invoke him to talk of Bangabandhu in his poetry (Goon, ami aj karo rakto chite ashini)

However, although Bangabandhu has appeared in a significant number of Bengali poems, both directly and indirectly, to date, scholarly critical attention on these poems has so far been insufficient. To my knowledge the recent significant contribution in this area is Suresh Ranjan Basak's *Bangabandhu in Bengali Poetry* (Basak). In his book Basu has discussed 136 poems written by 126 poets. While his discussion includes Shamsur Rahman,it is relatively succinct, centering on just two poems. In his critical work *Shamsur Rahmaner Kabitai Samaj o Rajniti* (*Society and Politics in Shamsur Rahman's Poetry*) Tanvir Dulal has discussed some poems in which he has casually mentioned the name of Bangabandhu (Dulal, 2021).In this regard, I believe that an in-depth study on Shamsur Rahman's poems concerning Bangabandhu is possible and necessary. It is important to note that in discussing the poems, the socio-political history of the period has been taken into consid eration. If not other wise mentioned, the English translations of the Bangla/Bengali texts are mine. For writing the Bangla words in English I have used the Roman alphabet, emphasizing their sounds. As the theoretical lens/perspective for analysis and interpretation, I have mainly used New Historicism. New Historiusm is a movement in literary criticsm that began in the 1980. 9ts man claim is that the themes and meaning of literature are not universal and cannot be derived from the text alone, rether they are the products of the autheor's time and cultural situation (Abrams, New Historicsm).

It is well-known to us that the three words– Bangabandhu, Bangalee, Bangladesh– are all intertwined. Historically, we know, the end of colonial rule in India did not bring any peace to this part of the globe. In 1947 the partition of India and Pakistan based on religion had created a void causing one of world's worst refugee crises and bloodshed. Pakistan consisting of the two territories– East Pakistan (East Bengal, later Bangladesh) and West Pakistan– appeared to be an absurd state. Apart from communal riot and killings, people of East Pakistan suffered serious deprivation at the hands of West Pakistani rulers. It was a kind of neo-colonialexploitation, both economically and culturally. By declaring Urdu as a state language of Pakistan, the

West Pakistani rulers first wanted to impoverish the voice of the Bangalees, their language Bangla and their culture and identity. In 1948, Bangabandhu, then a student of Dhaka University, played a role by organizing people against Jinnah's declaration– 'Urdu, Urdu must be the state language of Pakistan.' He was accused of playing arole in the movement and was imprisoned. However, the Language Movement gained momentum and culminated in the sacrifice of some valiant sons of this soil in 1952 and the West Pakistani rulers were compelled to withdraw their decision. Language Movement eventually played a crucial role in fostering a sense of identity and cultural pride among the Bangalees of East Pakistan and helped them to be united under the towering leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The struggle of the people under Bangabandhu's dynamic leadership gradually led to the Liberation War, and Bangladesh finally became free in 1971. Abdul Gaffar Chowdhury says: "Bangabandhu is not a mere individual. He is an institution. A Movement. A Revolution. An Upsurge. He is the architect of the nation. He is the essence of epic poetry and he is history (21)" In Shamsur Rahman's poetry we find the well and woe of Bangladesh from the 1950s till his death in 2006. This article attempts to analyze and interpret how Shamsur Rahman has depicted Bangabandhu in a number of his poems.

In Rahman's poems Bangabandhu appears as a Promethean hero–a protector of his people, a fiery face, a hero whose mission is to set things right; but again, this hero is a soft father figure, an embodiment of his people, a bridge to reach their root; at times this hero is sad and gloomy, a dead hero wronged by the very people he loved too much, whose resurrection is needed for his people. With his adept poetic craft, Rahman manipulated the 'objective co-relative' in some of his poems employing mythological characters and other elements to create a parallel emotion. In such poems he did not use the name Bangabandhu or Sheikh Mujibur Rahman directly. However, a careful reader familiar with the politics and history of the time can easily discover him from the poetic suggestiveness and words or phrases. For such an indirect approach Rahman's poems become more successful and universal as works of art, as well as more philosophical and symbolic in meaning. For children,he wrote rhymesthatare rich not only in music but also in content.

Metaphorically, Shamsur Rahman has constructed a 'father' figure in a number of poems, and this father figure may be identified with Bangabandhu if the poems are read with an awareness of the time and the socio-political history of Bangladesh. One of the earliest poems titled 'Pita' [Father] occurs in Rahman's first volume *Pratham Gan Ditiya Mrityur Age* [*First Song before Second Death*] published in 1960. In the poem, written in the first-person perspective, Rahman portrays a father who is obviously not thespeaker's biological father–'though not my biological father' (line 9). Nevertheless, the speaker wishes to ignite his 'silent hopes and aspirations' (line 6) in a country which is 'rough and ill-affected' (line 5).He patiently waits and seeks the help of this father who embodies both 'rebel' and 'protector'. The poem is written in a sonnet form with an octave and a sestet, octave rhyme scheme of ABBAABBA and sestet CDECDE. However, gradually, the father figure in Rahman's poems becomes more distinct. According to Humayun Azad 'father', in the poems of *Niraloke Dibyarath* [*A Celestial Chariot in Darkness*], the

fourth volume of poetry published in 1968, becomes a conscience, a protector figure from all the evils that loom large (79). This father figure takes obvious shape in the poem "Telimekas" ("Telemachus"), yet not directly. Here the poet uses Greek myth to find an association with the political unrest of then East Pakistan and the freedom-loving people's longing for freedom under the great leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.The mythical Ithaca, in absence of Telemachus's father Odysseus, the hero of Trojan war, is no other than the then East Pakistan (Bangladesh) in absence of Bangabandhu whose voice the Pakistani military rulers tried to stop by sending him to jail again and again. The poem evokes the emotion of fear, hope and nervousness that lurked in the minds of the people of East Pakistan when their hero was in jail. A careful reader of the poem can identify "sujala suphala" (well-watered alluvial soil) Ithaca as Bangladesh which fell under an evil grip. The masses longed for a national hero to libe rate them from Ayub Khan's autocratic rule. This longing echoes in Telemachus's yearning for his father's return, mirroring Sheikh Mujibur Rahman's return from prison. Shamsur Rahman himself discussed this creative function in his memoir *Kaler Dhuloy Lekha* (222).Humayun Azad notes, "Telemachus is a poem born out of the soil of Bangladesh in 1968. Most probably partly for the sake of art and partly for self-protection the poet has worn a mask (79)."

Image of Bangabandhu as a towering hero, but apparently in a pitiful condition in the prison, can be found in the poem "Syamson" ("Samson") from *Duhsamaye Mukhomukhi*(1973). According to the original manuscript "Samson" was composed on 5 October, 1971, when the liberation war was going on. The mythical and Biblical story of Samson finds a parallel with Bangabandhu. Samson, who was a terror to the enemies, was imprisoned by the enemies with the help of Dalilah, a charming woman who proposedmarriage, married Samson, and finally betrayed him leading to his capture.In the prison Samson gathers strength, makes a plan to destroy his enemies at the cost of his own life. Imprisonment could not paralyze Samson at all. The poem is written as a form of Samson's soliloquy in the prison. Suggestively, like Samson Bangabandhu was the victim of conspiracy, though differently. Samson's soliloquy can be identified with Bangabandhu's agony at Punjab's Mianwaliprison, when the Liberation War of Bangladesh was going on. In Samson's soliloquy we find anger and images of death and destruction which resonate with Bangabandhu' sanger against Pakistani army's devastation:

> You have blinded me so that your evil deeds no more come to my sight
> But my memories? Can you ever wipe them clean?
> What have I seen so long?
> Murder, rape, plundering all around
> Devastating cities, innumerable villagesburnt, destroyed!
> Helpless people– oppressed, scared, driven– Is this not enough?
> .... your pride shall be shattered, with absolute certainty
> Eh, I will destroy you all... (lines27-33; 44)

After Bangabandhu's assassination it became difficult for the poets in Bangladesh to write poems on Bangabandhu openly. Shamsur Rahman was deeply troubled by the country's political situation, the suppression of freedom of expression, and the

betrayal of the dreams and ideals for which the liberation war was fought. Some of the poems in his 1973 collection *Bangladesh Swapna Dekhe* (*Bangladesh Dreams*) echo this concern. The first poem of the volume, sharing the same title, narrates some nightmarish images about the future of Bangladesh and the worries accumulated on the face of a bronze statue emerging out of the soil, and this image can be identified with Bangabandhu:

> Bangladesh dreams of a bronze statue, huge and motionless,
> Rising in the dead of night, splitting the ground!
> His face is covered by a century-old thick sweeping moss and deep fissures
> Like painful bruises. Two strange eyes of bronze, very still,
> Staring at the darkness as if they had never seen anything
> Although they must have feasted on so many objects extending
> over a century (lines 1-8).

In some poems such as "Sonar Murtir Kahini" (Stories of Golden Statue)from *Shironam Mane Pare Na* (1985), "Dhanya Sei Purush" ("Great is that Man") from *Janmabhumi* (1986), "Nam" ("Name") from *Khub Beshi Bhalo Thakte Nei*(1987), "Bhaskar Purush" ("The Man of the Sun") from *Dhangsher Kinare*(1992), "Tomar Nam Ek Biplab" (Your Name is a Revolution) from *Akash Asbe Neme*(1994), the emotions of loss, repentance, wishful desire for the hero's resurrection, anger towards those who seek to erase the hero's name are beautifully captured with rich imagery and sensuousness. Among these poems 'Dhanya Sei Purush' catches special attention and is considered one of the most beautiful poems written on Bangabandhu.

The August trauma,15 August 1975, and reflections about its aftermath have been portrayed in a number of Shamsur Rahman's poems, two of which are distinctive. One is "Jar Mathai ItihaserJyotiBaloy" from *Hemanta Sandhyai Kichukal* (1997) and "His Whole Life was a Tireless Dedication"from *Swapna O Duhswapne Beche Achi* (2000). In "Jar Mathai Itihaser JyotiBaloy" the poet calls the killers 'Amabasya' who, by killing Bangabandhu, devoured light because Bangabandhu was the light-bearer for his people. The poem evokes emotion using personifying the inanimate objects and abstract things. Following are the opening lines:

> In Subesadik, when Muazzin's Azan kissed
> the sleeping cheeks of city-buildings
> the lips of footpaths and lamp-posts
> the chins of shops' signboards
> the sweat-dry foreheads of skeletal slum-children
> the quiet eye-lids of lake water
> the still-heads of standing trees
> the serene peace of birds' nests,
> It was then some cruel Amabasyas
> barged into the 32 Dhanmondi house (lines 1-8)

The poem describes how that colossal figure remained undaunted against the throngs of bullet that pierced his bosom– 'the moment the chest of Bangladesh is pierced (line 18)' and all the big rivers of Bangladesh are filled with blood. The extremity of cruelty is alluded to 'Karbala', the river 'Forat' cruel Shimar's 'shrill sword' etc. The poem also depictsthe tender aged Sheikh Russel's fear and the 'mehedi' colour on a

young woman's bridal hands. It was the cruelty that moved to tears 'the clouds, trees and plants,/ trembling grass-blades, birds, hearts of flowers–/all metamorphosed into an earth-shaken dirge (lines 23-26).' The poem, however, ends with a note of hope that Bangabandhu will shine through with his own grandeur: 'the shapla, shaluk, the doel, the crop fields will bow down to him/out of deepest pain/the incessant flow of water in Sraban/freezes and turns into a day of mourning/ stretching to the horizons'(lines 51-54). Rahman's unique application of metaphor, simile and imagery elevates the artistic quality of the poem.

The poem, "His Whole Life was a Tireless Dedication" composed in three stanzas comprising twenty-six lines, evokes love and respect for Bangabandhu, hatred for killers and a reflection on the tragic event. In this poem 'purnima' (full moon) is used as a symbol that refers to Bangabandhu. It is suddenly devoured by some 'toothy savage, mud worms, reptiles (line 2)' that exult inthe destruction of his magnanimity. But 'storm of bullets could never devour his magnanimity,/ sorrowful drops of tears are still glowed like stars in the sky/ And in distant grey horizon echothe songs ofhis glory. (lines 5-8)' It is worth noting that Rahman wrote this poem in 1998, two years after the Awami League Government under the leadership of Sheikh Hasina, Bangabandhu's daughter, came in power; this party came in power twenty-one years after Bangabandhu's assassination. With the political atmosphere now favourable many people were exploiting Bangabandhu's name to satisfy their selfish and ignoble desires, and Rahman expresses a concern in the last lines of the poem:

> Shall we again lose our way?
> With his name, immeasurable fame
> Of late goes shameless business
> Fear creeps in, lestthis name is covered with dust
> or slippery mud
> Then where will Bengal's sunrise find a refuge to hide its face (lines 21-26)

It is assumed that if Shamsur Rahman had been alive during Awami League Government's continued rule since 2008, for three consecutive terms, he might have even expressed greater concern about the exploitation of Bangabandhu's name for self-interest.

Poets are often considered seers, capable of seeing far ahead of their time. In the early 1980s, Shamsur Rahman observed Sheikh Hasina becoming active in politics. He tried to draw a parallel between Electra and Sheikh Hasina and composed the poem "Electrar Gan" (Electra's Song), included in *Ikaruser Akash*, 1982. The emotions Rahman created for Electra resonate with those surrounding Sheik Hasina. Note the lines:

> Assassinated father, Agamemnon, lying in the grave.
> I mourn behind the scene father, alone.
> My lament for you they consider a crime
> Even in all my dreams you are forbidden now
> Your daughter carries a heavy load! (lines 31-35).

The filial piety and a fiery zeal for vengeance are vividly portrayed in the poem through various figurative devices. Rahman's foresight proved accurate when Prime Minister Sheikh Hasina rose to power in 1996 and initiated the trial of her father's assassins that, afterwards, led to the execution of several of the perpetrators.

Shamsur Rahman's beautiful poem 'Dhaynya Sei Purush' (Great is that Man), without mention of Bangabandhu's name, appears in the work *Abiram Jalbromi* in 1986. In the opening lines of the poem the poet evokes a deep sense of admiration for him:

> Great is that man – who emerges from the deep water of a river –
> At the moment the sun is rising.
> Great is that man who from the blue hill top
> Walks down the green carpet of the dale–
> Teeming with butterflies (lines 1-6).

This great man is someone dear to the speaker and others like him. The following lines describe how patiently they wait for his arrival:

> Blessed are we, sure!
> We see that you still come from a distant horizon
> And we anxiously wait for you
> Like the thirsty deer in hot summer noon
> Looking for water(lines 9-16).

The next few-lines of the poem express the speaker's sense of guilt to that Great man:

> "Piercing your bosom blood-red *jaba* has bloomed like Pride
> And we stare at those flowers.
> Our eyes want not to wink
> Our traumatic guilt-ridden heads droop down."

The next few lines express the poet's concernabout the motives and attitudes of his fellow countrymen:

> "Look, one by one, all are treading the wrong path–
> A sheer downfall!
> Like disco dancers they have stated dancing at Manisha's Minar
> Keeping their conscience into oblivion.
> …
> The flatterers' lips are so fluent,
> Profusely producing words, days and nights.
> Look, some fruit tree is loaded with *makal* fruits.
> Love and affection are drying up
> Like sun-burnt grasses"

The poem vividly portrays the country's crisis in absence of a great leadership like Bangabandhu's, while also conveying a note of hope that he remains more than those who live:

> "Losing you, in days of crisis,
> We were mourning sitting in our dunghills.

Our tears made the sky grief-stricken
But you have transformed that grief into life's hymn
Because we know that you are more living than the living."

The poem ends with remembering the contribution of the freedom fighters:

Great is that manon whose name
Echoes the ecstasy of our Freedom Fighters.

Another beautiful poem, beyond using a name, is 'Aswikrito Tomar Mrityu' that occurs in the volume *Chyagoner Songe Kichukkhan*, 1997. This short poem exquisitely depicts the arrival of Bangabandhu in the political scene, how people responded to his clarion call and become united under his leadership but suddenly how he was covered up by 'a piece of black cloud'. The last lines of the poem illustrate his deathlessness:

Unacceptable is your death to the people of Bengal
For, they know you will remain alive
In springtime flowers,
You will remain alive in their vows and utterances,
You will remain alive in their love for humanity,
You will remain alive in the starry verses crafted by poets.

Shamsur Rahman wrote many beautiful rhymes for children; "Amar Nam" (Immortal Name) and "TabuoTini Raja" (Yet He is a King) are remarkable. In "amarnam" Rahman has captured the images of boy Bangabandhu very precisely for a child's mind– "A boy, a boy from village/ Rush to the fields/ Fresh smiles as the sun/ Blooms on his lip (lines 1-4)." Then in the second stanza– "He looks at the grass, the creepers/ Out of love/ The river Madhumati smiles at him (lines 4-8)." The third stanza describes the boy's heroism when grown up–"This boy being grown-up/Fight with the enemies/ Risking his life for his country." The fourth stanza describes more of his heroic actions: "He spends his days in prison and in torture/ Yet nothing he is afraid of/ When out of jail/ All attend to his call." The last stanza describes feelings of the objects of nature: "Tree leaves, dust/ tell him endlessly/ Bangabandhu Sheikh Mujibur/ Immortal is your name." Similarly in the rhyme "TobuoTini Raja" with his beautiful choice of words and Bangla *swarobritto*meterRahman produces an emotion of wonder and reverence for Bangabandhu. The last two stanzas of the rhyme is a reflection about the injustice done to him:

Killers from his home
Took his life;
But the victory goes to him
The killers must have their defeat
Whatever way the conspirators
Turn their wheels of history
His name is embedded
in the hearts of us all.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is an integral part of our history. Poets and artists from this landendlessly portray him in both fiction and non-fiction

works.Shamsur Rahman's poetic portrayal of Bangabandhu is largely interpretative, as he often refrains from directly naming him in his poems. In his paper I have examined and interpreted some of Rahman's poems, offering his depiction of Bangabandhu. However, this discussion is, in no way, exhaustive. Additionally the English translations of Rahman's verses have not fully captured the essence and beauty of the the original poems. It is hoped that this paper will contribute to the study of both Bangabandhu and Shamsur Rahman.

References

Abram, M.H. *A Glossary of Literary Terms*. USA: Harcourt Brace & Company, 1993.

Azad Humayun. *Shamsur Rahman: Nihsanga Sherpa* [*Shamsur Rahman: Lonely Mountaineer*]. Dhaka: Agami Prakashani, 2008.

Basak, Suresh Ranjan. *Bangabandhu in Bengali Poetry*, Dhaka: Bangla Academy, 2022.

Dulal, Tanvir. *Shamsur Rahmaner Kabitai Samaj O Rajniti* [*Society and Politics in Shamsur Rahman's Poetry*]. Dhaka: Maula Brothers, 2009.

Eliot, T.S. "Tradition and Individual Talent" in *The Norton Anthology of Theory and Criticism*. Ed. Vincent B. Leitch. New York: W. W. Norton & Company, 2001.

————————. *Selected Essays*. 3rd.Ed. London: 1951.

Gaffer, Abdul. "The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman" in *Father of the Nation.* Dhaka: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial Trust, 1997.

Goon, Nirmalendu. "Banglar MatiBanglar Jal" in *Nirmalendu goon*. Dhaka: Kakoli Prokashani, 2020.

Sydney, Sir Philip. "An Apology for Poetry" in *The Norton Anthology of Theory and Criticism*, Norton 2001.

Rahman Shamsur. *KabitaSamgra* [*Collected Poetical Works*]. Dhaka: Ananya, 2007.

Tagore, Rabindranath. "SahityerBicharak" [Critic of a Literary Work] in *RabindraRachanabali* [*Works of Rabindranath*] Dhaka: Oitijhya, 2004).

————————. "SahityerSamagri" [Materials of a Literary Work] in *RabindraRachanabali* [*Works of Rabindranath*] Dhaka: Oitijhya, 2004.

Jagannath University Journal of Arts
Volume 14, No 01, January-June 2024

Saga of the Subaltern- Religion and Politics in *Manush Hobar Kalponik Golpo*

Debasish Biswas*

Abstract

Subalterns have been subjected to torture and exploitation in the Indian subcontinent for ages. The situation is dire in the remote parts of India. This essay portrays how religion and hypocritical politics have brought untold sufferings in the life of a family living in a remote tea garden in Assam, India. At the same time, the essay explores the determination and resolve of the subaltern class. It also endeavors to unmask the hypocrisy of politics and politicians. Finally, the essay puts forward the thesis that justice and humanity prevail.

Keywords: caste, religion, faith, politics

The subaltern refers to people having no power, voice or status in the society. A relatively new branch of learning, subaltern studies has emerged as an independent field of study. The term 'subaltern' was first used by Gramsci in his Prison Notebooks and made popular in postcolonial discourse by a group of intellectuals led by the recently deceased historian, Ranajit Guha. Gayatri Chakraborty Spivak in her lecture "The Trajectory of the Subaltern in My Work" defines subalternity as the position without identity. She has contributed immensely in popularizing the theory.

Mahmud Akhter Shareef's novel *Manush Hobar Kalponik Golpo* portrays how a subaltern (santal) family working in a tea garden is tortured and exploited by a Hindu religious leader. The novel unfolds with Shibu Majhi's loss of her ancestral land to a political leader, namely Bihar Sharma. Shibu Majhi, a Santal, is a worker in the tea garden while Mr. Sharma is an influential leader of the ruling political party and a higher caste Hindu. Hindu religion teaches not to be greedy for anything. Bhagvad Gita counts greed as one of the three doors to hell. This, however, does not deter the (higher caste) Hindus from being greedy and Bihar Sharma is a glaring example to this. He doesnot spare a small piece of land belonging to helpless Santal. As a way out, Shibu comes up with the idea of converting to Hinduism so that the land grabber spares him. We may add in this connection that a lot of lower caste people converts just to save them from the aggression and exploitation of the dominant caste. Being fed up with the tyranny of casteism, B R Ambedkar also converted to Buddhism. Much for similar reasons, Shibu Majhi converts to Hinduism and desperately hopes that this conversion would soften the heart of the Hindu religious leader, Bihar Sharma. That does not happen in reality though. Shibu eventually loses his ancestral land to Bihar Sharma and gong. It must be agonizing for the reader as well that Shibu relinquishes his religion for the sake of his land but

*Associate Professor, Institute of Modern Languages, Jagannath University, Dhaka

eventually cannot retain the land. Shibu mistakenly expects religion to be a protector and shield him against the land grabbers, but religion miserably fails to live up to its expectations. In addition, Shibu is utterly shocked by the fact that the land grabbers are highly educated and religious but devoid of humanity. Shibu has learnt from his father that being human should be the topmost priority in a person's life. He perceives that education may have something to do with attaining humanitarian qualities. But when he sees educated Hindu elites plunder his asset, he is utterly disillusioned. Thus, Shibu Majhi makes a very wrong calculation that his conversion will elevate his status and set him at par with the Hindus. To his horror shock, Shibu remains the lowly Santal in the eyes of the Hindus. And Bihar doesn't seem to have the minimum consideration of Shibu's conversion to Hinduism in grabbing his land. Unequal power relationship also plays a part here. The high caste Hindus are powerful in the society. They know fairly well that a poor convert like Shibu will not be able to do much against them. As Shibu doesn't agree, he is brutally killed by Bihar Sharma. As per Satre, life for the surviving family begins on "the other side of despair".

The hapless and helpless family of Shibu doesn't get justice just because they are powerless. Bihar Sharma goes scot-free which makes him even more daring and desperate. By murdering Shibu, he has been able to clear the biggest obstacle. At the same time, he has been able to terrorize the family. Apart from the piece of land, Bihar has fallen for Dipali the exquisitely beautiful daughter of Shibu. In an opportune moment, Bihar asks Chaitali, Shibu's wife, to meet him. (In addition to the piece of land, Bihar now starts eyeing his beautiful daughter Dipali.) Bihar summons Chaitali and expects her to bring Dipali with her. Seeing Chaitali, Bihar in a sympathizing tone says that he fully realizes and appreciates her pains of bringing up her daughter Dipali. Bihar says this to soften Chaitali's heart. It is now Chaitali who can help Bihar achieve his plans of grabbing both her land and daughter. During the conversation Chaitali observes that Bihar is seducing her with his eyes. Without wasting time, Bihar comes straight to the point. In an accusing note, Bihar alleges that Shibu didn't heed to Bihar's command of selling the piece of land to them. He adds that the piece of land will suit best for his party office. In a haughty note, Chaitali retorts that the land belongs to Shibu and she can't sell it without Shibu's consent. Bihar goes mad but laughs sheepishly that resembles a fox. With a wide smile, Bihar says " Will you go to Shibu?" Chaitali can't figure out if it is a mockery or a threat or a combination of both. During the entire conversation, Bihar's eyes remain glued to the breasts of Chaitali. It comes as no surprise to us that a man greedy for land will be equally greedy for women. Now thather husband is gone, Chaitali and her daughter fall easy prey to Bihar. Bihar's close associate Sardarji Ramlal is equally crooked. Chaitali suspects him as the killer of Shibu. This Ramlal is particularly critical about Dipali's being educated instead of being a tea garden worker, like millions of her class. The dominant caste Hindus don't easily accept the education of lower castes. Thus, they are alarmed by Dipali's determination to pursue education. Ramlal becomes a spokesperson for the caste Hindus and passes

the message to Chaitali as to how the caste Hindus are displeased with Dipali's education. When Ramlal formally calls Chaitali to meet him to have a word regarding Dipali's education, the first thing questions that he fires is- "Hey Chaitali, will your daughter be a judge or barrister? This very question speaks volumes about the anger and insecurity of the elite Hindus. Dipali as a girl from the downtrodden caste pursues education and promises to outshine many of the elites. In reply to Ramlal's question, Chaitali retorts- "What's your problem with that? I will educate her and make her grow to be a qualified person.Ramlal claps and smiles wryly. Then he comments- "You didn't tone down even after losing your husband, I see. Enough is enough,now get the girl work in the tea garden." Undaunted, Chaitali retorts "Dipali will not work in the tea garden. She will work a job after her studies. "This reply maddens Ramlal and he says that the babus in Nazira are well aware of her daughter. They don't like the idea of Dipali's studies. The other day, Bihar Hoozor was asking him to get the girl work in the tea garden. Making an offensive noise, Ramlal says in wild rage- "You still have time, get your daughter to work. And get her married by selling your home at Nazira. You will repent later. The leaders of Nazira don't like your idea of sending your growing daughter to school. "

Bihar Sharma, the joint secretary of Rastriya Sevak Sangha (RSS) of Assam is quite a powerful man. His father was the priest of the biggest temple of central Assam while his maternal uncle was a founding member of Rastriya Sevak Sangha. His father taught him that the Brahmins are God's favored caste. God's choicest blessings are for them alone. The following piece of his advice of his dad is still fresh in his mind- "Listen Bihar, the untouchables around us are all our servants. Don't try to befriend them. "Bihar was a boy of mere ten years then. Shell shocked, the lad looked at the face of his priest father and said- "But dad it is you who preaches in the temple that all men are equal." Seeing the naivety of his young son, the crooked dad smiles and says- "You have to get the underlying meaning of a statement, myson! When the Communists say that all are equal, they mean that there will be no difference between the rich and the poor. When the Capitalists say that all are equal, they mean that everyone will have a voice, but the rich won't heed. And when we priests say that all men are equal, that implies that all have equal rights! "Like father like son, as they say. Bihar replicates all his dad's tenets and idiosyncrasies. He has made them the mantra in his life. But his maternal uncle has a greater influence in Bihar's political career. To his maternal uncle, other than the higher caste, none is 'human beings'. His uncle often says that India is only for the Hindus; people of other religions will not live here. Hindus of lower castes will live here. They are useful. Smiling wryly, the uncle instructs Bihar, "impregnate the girls of other religion. "This is a fine example of the hypocrisy of the priest. What he says in the temple is a mere lip service. Bihar gets the essence of his uncle's ideology when he grows older. He learns from his friends that his uncle has four concubines of which two are *Garos* and two are Muslims. Bihar laughs remembering that his uncle said in a program of Rastriya Sevak Sangho (RSS) that all Muslims from Assam have to be driven out. On the same night Bihar overhears an intimate and

licentious telephone conversation of his uncle with one Ferdousi where he claims that his wife can't give half the pleasure she gives him. He then informs the lady that he is going the next day only to impregnate her. Bihar can't hear what the lady on the other side of the phone says but he is doubly surprised by what his uncle promises- "Don't worry darling, I will drive Ajit Bhowmik out of Assam right this month. Bihar Happens to know this Ferdousi Begum who is widow and a teacher at Gouripur school. And Ajit is very poor and a confirmed bachelor. He lives alone in his inherited house of one Chandra Sheikh.

There goes a saying in the Indian subcontinent that humans are carbon copies of their maternal uncles. It is, thus, no wonder that Bihar joins RSS, the party founded by his own maternal uncle. At the same time, he becomes a blind follower of his uncle. For the last ten years he has been eyeing the piece of land owned by Shibu Majhi. He would like to turn that house into his "*Jalsa Ghar*" (used for merriments, a *Jalsa Ghar* with a dance floor, was an integral part of the Kings and Nawabs of the olden days). It is interesting to note that a mediocre political leader like Bihar Sharma dreams of a life the *Maharajas* and the *Nawabs*. The sole intent of a political leader should be public welfare. A true political leader hardly has any ambition to satisfy his personal ill will. At this point of the story, we come to know that much like his maternal uncle Bihar Sharma is a womanizer and he is satisfying his desires in hotels of the town. Now that he has grown older and secured a more responsible post in the party, this does not befit him. Bihar is now the joint secretary of all Assam and rumor has it that he is going to be a minister if BJP if voted to power. Bihar has been eyeing Dipali, the exquisitely beautiful daughter of Shibu Majhi. He feels restless at the very thought of the girl. Bihar tries to figure out the secrets behind a Santal girl's beauty. He comes to the conclusion that God has blessed a Santal girl with this beauty just for the enjoyment of an upper caste like Bihar. Had Dipali been a Brahmin girl, she would have been out of reach of Bihar. Thus, we see that Bihar has been an heir to his maternal uncle in terms of lust. Women belonging to inferior castes often fall victim to this lust. The preaching of RSS makes the lower caste people feel even more cornered. They are made to think that they are born to be slaves of the high caste Hindus. These untouchables, however, cater to the lust of the hypocrite caste Hindus in the darkness of night. At night, untouchability doesn't pollute the caste Hindus.

The politicians are scared of education of the lower castes though they stress the importance of education whenever they get a chance to talk on this issue. They know that education gives a person voice and agency which are dreaded by the politicians no matter how powerful they are. They can't exploit an educated person or community. Their unjust domination is challenged when the target community get educated. Dipali, thus, becomes an incurable headache for Bihar. He gets increasingly nervous and worried as this girl keeps advancing her education. Every now and then he has conveyed his displeasure regarding the education of the girl but Dipali and her mother have proved resolute. Now that Dipali has finished her secondary education and wants to enter college, Bihar gets doubly anxious. Thus, he

instructs Ramlal to warn Chaitali sternly not to send Dipali to College. Ramlal calls Chaitali and conveys the message of Bihar. Chaitali is shocked but not scared and gives befitting replies. Looking in the eyes of Ramlal, Chaitali says with a wry smile that they are no longer renting out their house at Nazira. They will live there. This refusal from Chaitali and Dipali is a mighty blow to Bihar. We must appreciate the determination that Chaitali shows in continuing Dipali's education andwe can say that the family has gained considerable strength from Dipali's completion of secondary education. The decision of living in their house at Nazira means that they are not selling that property to Bihar. This decision maddens Bihar like anything. He is greeted with the news when he is just back from the party office. Bihar spends the day in meetings with party high ups. The speech delivered by the party secretary still rings in his ears. The secretary stresses that the Brahmins must reach Hinduism at the doorsteps of the untouchables and as remuneration they are entitled to enjoy them. But he reminds everyone that the untouchables, by no means would be touched at day light or in front of others. Bihar is super excited to find the secretary holding the same opinions as he does. As the central leaders hold extremist views on these issues, the regional leaders merely replicate them.

Ramlal sees Bihar to covey the outcome of her meeting right after his meeting Chaitali. Now Dipali has made up her mind to study at the College staying at their home at Nazira. Though alarmed by this development, Bihar doesn't react. He is in a good mood today and for good reasons – Mrs. Asma, a lady with extraordinary sex appeal is coming to see him tonight. Thus, he is putting the Dipali issue aside and asking Ramlal to leave for the time being since he has a lot of other business to pay attention to. He casually remarks that he doesn't mind if Dipali continues her education. This statement renders Ramlal confused.

Bihar's hypocrisy is evident from his Labour Day address. He appeals to the labourers to be humans by reiterating his sermon that the real Hindus are the only humans. God can be reached only through the service of other humans and everyone must pursue education for this. Finally, Bihar stresses on the need forloving each other. That these sermons are all fake is revealed in the incident that follows right after the meeting of the Labour Day. Attending the meeting, Chaitali gets back home late that night. To her horror shock, she finds Dipali gagged and gang raped. Her legs and hands are tied and she is bleeding profusely. As Chaitali unties her, Dipali gets up, washes herself and bursts into tears. Composing her a little, Dipali says that it was Bihar Sharma and two of her sidekicks who raped her. Chaitali also knows the gang. All of them belong to RSS and want to turn India a land only for caste Hindus. In a flash Chaitali remembers what Bihar Sharma said in his address for the Labour Day meeting- "We Brahmins will make this society a sacred one; God has sent us to uplift you guys to humans" This is a fine example of upliftment indeed! Right after the address, he rapes Dipali.

The rape incident leaves Chaitali and Dipali devastated. None of them goes out. They spend two days crying and decides not to disclose this incident. If they

expose Bihar Sharma, they will surely be driven out of Assam. Dipali stops going to college. The rape eventually comes to light after five months as Dipali shows the symptoms of pregnancy. Now Chaitali is drowned in despair. Losing her husband, she pinned all hopes on Dipali. Her education stops as the fetus in her womb grows. Chaitali is left with no choice but to abort. Dipali, like all would be mothers, grows a bonding with the baby in her womb and does not feel like getting it aborted. When her mother approaches Dipali for abortion, Dipali declines. She argues that she will keep the baby so that she doesn't forget the beasts who raped her and killing the baby will an act of brutality. Chaitali cries out at this reply saying what the society, religion, and people will say to this pregnancy of an unmarried girl. Chaitali is even more surprised when Dipali says in a firm voice that she doesn't mind sacrificing society and religion for the sake of the fetus. In reply, Chaitali says that the Hindu priests won't accept this. Bihar Sharma, however, keeps giving hypocritical sermons as Chaitali goes to see him in his party office. He advises the party workers to respect girls as they belong to the class of mothers. Taken aback to see Chaitali in the office, Bihar composes himself rather quickly and asks her to take a seat in the next room. Going to the room after around half an hour, Bihar asks how Chaitali is doing and how her daughter is doing in the college. Bihar also asks Chaitali to bring her to his house someday. Stunned, Chaitali doesn't let Bihar prolong his lip service and retorts with clenched teeth-" Dipali has a six-month pregnancy. Why did you ruin my daughter?"

Bihar is not moved by this allegation. With a smile he says, "Listen, you Santals are our servants. God has created you to drink the water used to wash our feet. "Chaitali cries out and threatens to lodge a complaint to the priest of Rambilasa temple. Unmoved, Bihar poses a counter question- "Who knows if she has slept with a Santal or sweeper on the excuse of going to college?" Then he advises Chaitali to see the priest and to purge the sin. Now we are shocked by a ghastly gesture of Bihar. He grabs his genital by thrusting a hand into his pajamas and says wryly-" Despite being a Santal your daughter dreams of my penis! "Tapping on his penis with his righthand Bihar adds-" What better to do? You will have to bathe with its water to go to heaven!" Chaitali can't take it any longer and quits the place with Borun, her cousin. It is not that Chaitali is alone in front of Bihar. She is there with her cousin, Borun.

Chaitali is really puzzled as to what should be her next action. It is for the first time that she thinks that only damned beasts are born as lower caste Hindus. Otherwise, why should they be so miserable? Chaitali sees Shiv Bhowmik, the priest of Rambilas temple to lodge a formal complaint against Bihar Sharma. Shiv Bhowmik is not surprised to learn that Bihar Sharma is the culprit. He, however, doesn't show any reaction and we can understand why. People like Shiv Bhowmik are mere puppets at the hands of mighty people like Bihar. Mr. Sharma seems to have endless tricks up his sleeve. He calls for a ' salisi' (a village court to try an offender) to try the culprits of the rape. What a mockery! The offender is up to trying the (innocent, imaginary) offenders. Hands of Dipali and Chaitali are tied at their back and they are seated on the ground. To her utter shock and surprise, Dipali finds that she is going

to be tried by none other than the culprit himself. After a little while, her cousin Borun, garlanded with shoes, is brought as a convict to the 'Salisi'.Dipali doesn't cry, nor is she surprised, she just casts a curious look at Bihar. Her mother tries to cover the swollen belly of Dipali with a scarf but Dipali keeps removing the scarf to let all see his belly. Bihar lectures-" these dirty girls don't have any place in our Hindu society. They must be sacrificed to safeguard the society." The priest of the local temple, Rambilash in his concluding speech remarks -" Religion wants us to find out virtues instead of sins. We won't bother finding out who this girl is involved with. Rather, we will try to bring this girl to light." The priest is another hypocrite, we see. Being a priest, he holds a considerable influence over the society and from this understanding Chaitali approaches him. It is for her naivety that Chaitali fails to read the stand of this priest. From the body language of the priest, she should have been able to understand that the priest is nothing but a puppet at the hands of Bihar.

The 'Salisi' reaches the verdict that the heads of Dipali and her maternal uncle be shaven and then they will be made to roam around the village. (This is a typical punishment for any offence in the rural Asia. In many instances, the offenders wrongly accused and many of them commit suicide). Before this, an attempt is made to purge their sin by making them to eat cowdung. The three are confined to separate rooms at night. Though not directly involved, Chaitali is confined on the allegation of collaborating in the offence. At midnight two of Bihar's sidekicks enter Chaitali's room and hangs her with the ceiling fan and pass it for a suicide. Bihar decides to pay a visit to Dipali's room late at night from the thought that the girl would be purged the following morning. He, however, fails to realize this plan. Bikash Goswami,the assistant priest of Rambilash temple spoils the plan. Defying a death threat, he scales the back walls and enters Dipali's room after midnight. He finds Dipali awake and looking vacantly at the night sky with one hand on her swollen belly. Dipali is not alarmed by the presence of the priest. It's likely that she takes the priest for another rapist. Without wasting time, the priest says- "They will kill you in the morning. I am helping you to escape. Quick." In response,Diplai says mockingly that they are supposed to be purgated the following morning by him. Bikash is a little taken aback but composes him quickly. What Bikash says in response is worth reckoning- " Please don't say this, mother. When you grow up, you will realize that religion makes a few real human beings. Do you know why? To bring peace in this world. On the other hand, some people create religion to deceive others and grab power. Bihar Sharma and our priest belong to the second camp. But mother, please don't lose faith on life. You will find a lot of people of the first group."

The assistant priest actually correctly divides men into the two groups. The number of people in the first group definitely outnumbers the second group. It's this group that has kept this world livable. This group stands like a wall against any injustice in the society. They support the victims and those who are vulnerable. He actually makes a lot of sense. Majority of the human beings are kind, benevolent and protective of the distressed. It is this group of people who does all sorts of humanitarian works. In the recent history we have found how goodhearted people

have volunteered in the Rana Plaza disaster in Savar, Bangladesh and risked their own lives. Had these people not come forward, it would have been exceedingly difficult for the government rescuers to handle the disaster. During the Covid 19, we have seen how the good souls have come forward to help the distressed. Thousands if not millions of Bangladeshi people were face to face with starvation due to massive job loss due to lockdown. The lockdown banned vehicular movements and the country came to a standstill that worsened the situation. Our volunteers from all walks of life came forward with in a wartime urgency. They reached food, clothes, medicines, oxygen cylinders. In the early phase of the pandemic, people were full of rumor and misconceptions. For example, people dared not touch a dead body from the fear of contracting the virus. There was an incident where a son left the dead body of his deceased mother. Dead bodies were denied burial in villages. When relatives were reluctant to bury the dead bodies a group of volunteers came forward and ensured decent burials. Biddyanondo could be named as another example. Through a number of initiatives they are making differences in the lives of millions of people in Bangladesh. One of the major initiatives of Bidyananda Foundation is the distribution of winter clothes among the destitute and underprivileged people. Unemployment is the talk of the country for quite some time. Bidyanada has come up with an initiative titled SOMBOL which is creating employment opportunities for millions of unemployed people across the country. They are helping people to establish small shops, chicken, cattle and fish farms. They are also helping the fishing community by donating nets, boats and other fishing accessories. Through this initiative they are also teaching people the trades of weaving and tailoring. Every year they are providing scholarship for thousands of underprivileged students who are forced to drop out from school. In a country of (so called) food surplus, it's rather a shock that millions don't get to eat two square meals. This warrants a serious reckoning on the part of policy makers. Unfortunately, we don't yet see any tangible action. Bidyanondo has come up with plans to do their bit. They are offering food in exchange for a mere one taka. For an explanation of this price, Bidyanando says that the buyers of this food programme will have the satisfaction of paying an amount, no matter how small the amount is. Thus, people working for Bidyanada certainly fall into the former group. Thus, there are so many examples to validate the point of the assistant priest.

What the assistant priest says next is really worth reckoning. He urges Dipali not to lose faith on life and humanity. Now let's have a look at this term "faith". The word comes from the latin "fide". In medieval Europe faith was synonymous with religion. Faith depends upon neither proof nor reason but belief in something to be true. Faith is the cornerstone of a few leading sub-continental religions like Hinduism, Jainism and Buddhism. In Hinduism, faith has crucial role and it works as a basis of all assumptions, beliefs, and inferences. Upanishad identifies heart as the resting ground for faith. Faith on life can be termed as faith in justice or humanity. There are times in our life when we find it difficult to sustain this faith on life. Dipali and Chaitali are going through this sort of difficult time. What Dipali says in reply as

the assistant priest wants her not to lose faith is equally convincing. Dipali says that she would have aborted the child in her womb, if she had lost faith on life. This gesture of Dipali also reassures us that holding onto hope is what is important. The assistant priest now proposes to free Chaitali who is in captivity in another room. They move in only to see her mother hanging from the ceiling fan. Dipali readily gets that her mother has already freed herself from this filthy racket. Dipali takes it for suicide and reproaches her mother for being timid. She, however, finds a few cigarette butts and figures out that it is not a suicide but a murder by Bihar Sharma and gong. Bikash lowers the body from the fan and detects quite a few scratches and some of them are quite deep. That bears a testimony that before death Chaitali put up a brave fight against the perpetrators. A piece of skin is stuck in one of her nail tips. Dipali sits by her dead mother and ruminates how a piece of land wreaks havoc to a family. She also ruminates how helpless the lower caste people in the face of political clouts. Had they belonged to the upper caste, Bihar Sharma and gong might have thought differently. They are not in a position to raise voice against this gross injustice. Dipali perhaps is also taking herself to task for her uncompromising stance in pursuing education which might irk and insecure the caste Hindus. The caste Hindus might have taken Dipali for a potential spokesperson for the distressed, depressed and deprived lower caste. Education gives one voice and it is very likely that Dipali would be a change maker. For the lack of this very change makers, the caste Hindus are exploiting the lower caste Hindus since time immemorial. Reformers like Jyotirao Phule and B. R. Ambedkar have dedicated their lives for the upliftment of this lower caste Hindus in this subcontinent. Phule along with his followers formed Satyasadhok Samaj (society for truth seekers) to ensure equal rights for lower caste people. In those days there were no facility of education for the lower caste people. Phule educated her wife Savitribai and the couple founded India's the first girls' school in Pune in 1848. Phule also championed widow marriage. B R Ambedkar belonged to the untouchables but eventually became the leading voice against casteism. In his later life Ambedkar converted to Buddhism.

Shell shocked by the incidents that are unfolding, Dipali forgets or doesn't have the energy to cry by her mother's dead body. She just closes the eyelids of her mother and says the following words for her mother- " Mother, please don't be surprised but you can be scared because even the beasts dread the religion mongers!" Bikash, the assistant priest warns that Dipali is risking her own life by lingering her stay by the dead body of her mother. Dipali also realizes that due to the threat on her own life she won't be able to arrange a decent burial for her mother. Lingering means inviting troubles not only for herself but also the baby in her womb. And this will be tantamount to killing her own baby which she can't do as a mother. Not only that the assistant priest will also be killed if he is found here. So, Dipali must clear out from the scene to save the three lives. But she feels too heavy to move. She removes the skin that is attached to her mother's nail so that the latter is not dishonored. Bikash again hurries her to flee and tells her that he is taking her to one of her Christian friends Robert Gomes. Diplai is now taken by an overwhelming surge of emotion

and thus in a dilemma as to what she should do. Will she give up her ancestral land to Bihar Sharma and gong? Will she abandon her innocent maternal uncle who is subjected to inhuman torture? Will she leave behind the Behubar tea garden where she has grown up and has innumerable memories? She bursts into tears. Her world revolved around her mother after she lost her father. Her mother did everything possible to educate Dipali. It is exceedingly difficult now for her to abandon the dead body of her mother. She recalls her mother once telling that she would never marry of Dipali as it would be impossible to live without her. What an irony now to leave her mother forever. Dipali casts a final look at the dead body and apologizes to her mother for not being able to perform the funeral rites. Bikash rushes out holding Dipali's hand to reach a motorbike that is waiting to pick them and drop off at the Church in the custody of Robert Gomes. Bikash now tells her that Robert will convert Dipali to Christianity and take her to America. Dipali is taken aback by this proposition. Addressing the priest as father, Dipali says-" Being a Hindu priest yourself you are asking me to convert to Christianity? "To help people live is religion! To kill them is not! " Bikash replies. This statement of Bikash is reassuring and reinstates our faith in religion and humanity.

In conclusion, it can be said that religion and humanity ultimately prevail. Though corrupt and manipulators like Bihar Sharma use religion and politics for all the wrong purposes, good souls like Bikash and Robert Gomes come forward to safeguard the image of religion.

References

Dr Babasaheb Ambedkar writings and speeches, Volume 1. Retrieved from https://velivada.com/2016/01/31/pdf-writings-sppeches-of-dr-babasaheb-ambedkar/.

https://www.holy-bhagavad-gita.org/chapter/16/verse/21.

Gramsci A. (1971). Selections From Prison Note Books. Quintin Hoare (ed.). International Publishers. New York.

Sartre J.P. (1965). Oxford Essential Quotations. Published online, retrieved from https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780191826719.001.0001/q-oro-ed4-00009124;jsessionid=75EFCA141C036C5DBA3A7E21F4CEB9E6.

Sharif, M.A. (2020). *Manush Hobar Kaloponik Golpo*. Onnoprokash. Dhaka.

Spivak, G. C. “The Trajectory of the Subaltern in My Work”. Voices: A UCSB Series.13th Sept.2004.n.pag.Web.15th Nov.2012.

Jagannath University Journal of Arts
Volume 14, No 01, January-June 2024

/r/ in Bangladeshi Accent : Rhotic or Non-rhotic? A Case Study

Jakir*

Abstract

This paper investigates whether Bangladeshi English is rhotic or non-rhotic. For this purpose, data were collected from 25 tertiary level students of the department of English, Jagannath University, Bangladesh, selected through simple random sampling. A reading passage containing the English /r/ in different positions (pre-vocalic and non-prevocalic positions) was developed. The words containing the /r/ were chosen carefully so that they represent different dimensions of rhoticity in English. The selected participants were asked to read the passage aloud and their pronunciation was recorded with the sound recorder of SAMSUNG M10 mobile set. After recording, their pronunciation of the English /r/ in different positions were transcribed into IPA (the researcher himself transcribed these words). Furthermore, two phoneticians were employed as raters and they gave their valuable opinions after listening to the recordings of these participants on the quality of rhoticity. The transcribed data and the phoneticians' opinion indicate that most of the participants pronounced the /r/ very prominently in all of the words while they were reading the given passage aloud. So, this study was carried out with a view to contributing to the teaching and learning of rhotic and non.rhotic accent to Bangladeshi EFL learners.

Keywords: rhoticity, transcribed, pronunciation, recorded, and IPA

Introduction

According to Roach, English /r/ is a post-alveolar consonant (1991). He, furthermore, emphasizes that this phoneme is pronounced in different accents of English with considerable difference (1991). In the following section, an analysis of this phonemes is detailed briefly:

Place of Articulation

When English sound /r/ is produced, no closure is formed to obstruct the air flow: the tip of the tongue approaches the alveolar area but does not make any contact with any part of the roof of the mouth and the two lips are a bit rounded (Roach, 1991). Furthermore, the tongue is slightly curled back to the post alveolar region (Ibid). So, this is called a post-alveolar consonant.

Manner of Articulation

When this /r/ is produced, the air flow from the lungs passes out through the passage between the tongue-tip and hard palate without making any friction noise (Connor,

*Associate Professor, Department of English, Jagannath University, Dhaka

1980). For this reason, /r/ is called a frictionless continuant. This sound is also called a glide (Connor, 1980) or an approximant (Roach, 1991).

Voicing Quality

When English /r/ is articulated, vibration occurs in the vocal folds. So, this is a voiced sound. However, when preceded by the consonants /p/, /t/ and /k/ sounds, /r/ is devoiced (Roach, 1991).

Length

English /r/ is a quite a long sound (Hooke & Rowell 1982)

Distribution of English /r/

In RP, the consonant /r/ occurs only sin pre-vocalic position (Roach, 1991). However, at alphabetical level, the consonant letter 'r' can be found before consonants and also in the final position without a following vowel. In such situations, /r/ is never pronounced in RP and so, it is called a non-rhotic /r/ in British English (Ibid). On the other hand, in American English, the /r/ occurs in all positions - in the initial, medial, and final positions. So, the /r/ is defined as a rhotic sound in American English (Roach, 1991).

In the present study, the researcher investigates how Bangladeshi learners pronounce the /r/- as rhotic or non-rhotic.

Literature Review

Rhotic accent in English is linked to phonology and phonetics. Phonetically, investigations on rhoticity comprise auditory, acoustic, and articulatory research. According to Delattre and Freeman (1968), rhoticity is common in North American English. For example, the word *river* is pronounced as /rɪvər/ where the /r/ is rhotic.

Zhou et al., (2008) also focus on the phonetic properties of rhoticity in North American English. They also found the /r/ in their study to be pronounced as rhotic. For example, the word *car* is pronounced /kɑːr/ where the /r/ is rhotic.

Similarly, rhoticity is also very prominent feature in Scotland (Lawson et al., 2018). For example, the /r/ in the words in Scottish English is pronounced prominently in all positions as in the words run /rʌn/ (initial position), bird /bɜːrd/ (before consonant), and tour /tur/ (final position).

Rhotic accent is also prevalent in the Southland region of New Zealand even though there is the common assumption that New Zealand English is entirely non-rhotic (Villarreal et al., 2021). For example, the words here and *march* and in the Southland region of New Zealand are pronounced /hɪər/ and /mɑːrtʃ/ respectively where the /r/ is rhotic.

Wells observes that rhoticity in England had its major decline in the 18th century (1982). Gordon et al. (2004) show that the speakers who were born in the mid-to-late 18th century England had some kind of rhoticity. For example, these speakers

used to pronounce the word near as /h**ɪə**r/ where the /r/ is rhotic. Moreover, Lass (1997) argue that non-rhotic and rhotic accents co-existed in the communities for hundreds of years. For example, the /r/ in the word *poor* was pronounced both as rhotic and non-rhotic in the past.

Foulkes and Docherty opine that rhoticity in England in the present day is heavily stigmatized (2007) while Barras (2011) argues that it represents a national rural stereotype. Furthermore, it is employed in media representation of characters for 'comic effect' (Trudgill, 2000). Again, back in the 18th century, the absence of non-prevocalic /r/ was subject to negative judgments (Carpenter, 1868; Jones, 1989). The same kind of social evaluation, which is also seen in the present-day North America, likely switched after the first few decades of the 1800s (Beal, 1993).

In the context of Bangladesh, there is hardly research on the rhoticity in Bangladeshi English. The present paper is an attempt to find out whether Bangladeshis speak with a rhotic accent or a non-rhotic one.

Objectives

The general objective of this study was to investigate whether Bangladeshi English is rhotic or non-rhotic. The specific objectives were:

a. to find out whether Bangladeshi speakers of English pronounce the /r/ in the word final positions

b. to find out whether they pronounce the /r/ before consonants**.**

Methodology

A quantitative approach was adopted in this study. Data were collected through recording and analyzed through descriptive statistics.The study was conducted in the department of English, Jagannath University, Bangladesh.Data were collected from some 25 students of English department, Jagannath University. As the total number of population was 75, one-third of this population was selected randomly as the respondents of the study. They are studying in the 2nd year 1st semester.

The study area of this research was selected conveniently. As the researcher works as a teacher in this department, it was convenient for him to collect data from his students. Besides, as this study required recorded pronunciation of the learners, the researcher felt comfortable to conduct the study in his workplace. However, simple random sampling was used to select the participants for the study. Moreover, for rating the rhoticity, two English teachers (they are ELT experts as well as phoneticians because they deal with phonetics and phonology in the same department) were selected purposively.

A reading passage containing the /r/ was developed. This passage was developed by the researcher himself. It was not copied or modified from any source. In the passage, the /r/ sound occurs 19 times (3 times in the word initial position, 10 times in the final positions, 3 times before consonants, 2 times after consonants, and 1 time in the intervocalic position,

Participants read the passage aloud and their pronunciation was recorded with the sound recorder of SAMSUNG M10 mobile set.

The Data collected through recording were first transcribed into IPA. Then these data were tabulated using SPSS. Finally, descriptive statistics, that is, percentage was used to analyze the data. Furthermore, experts' comments are also presented descriptively.

Discussion of the Findings

Pronunciation of the /r/ in the initial positions:

All the participants pronounced the /r/ occurring in the initial positions of the words *Rimi (this word occurs 3 times) was pronounced clearly as rhotic /r/.*

Pronunciation of the /r/ in the final positions:

Most of the pronunciation (89.75%) of the /r/ occurring in the final positions of the words *mother, father, her, dear,* and *near,* was found to be rhotic /r/. Only 10.25% pronunciation of the /r/ in these words was found to be non-rhotic.

Table 1: Pronunciation of the /r/ in the final positions

Words	**Learners' Pronunciation**	
	Rhotic (%)	**Non-rhotic (%)**
Mother	88	12
her	92	8
father	96	4
near	88	12
dear	84	16
Aggregated (%)	89.75	10.25

Source: Oral Data

Pronunciation of the /r/ before consonants:

Most of the pronunciation (86.67%) of the /r/ occurring before consonants in the words *party, thirteen,* and *birthday* were found to be rhotic. Only 13.3 % pronunciation of the /r/ in this position was found to be non-rhotic.

Table 2: Pronunciation of the /r/ before consonants

Words	Learners' Pronunciation	
	Rhotic (%)	Non-rhotic (%)
party	88	12
birthday	84	16
thirteen	88	12
Aggregated (%)	86.67	13.3

Source: Oral Data

Likewise, two phoneticians (two teachers who deal with phonetics and phonology in the department of English, Jagannath University) gave almost the same opinion on the rhoticity of the /r/ in this study. Both of them opined that most of the learners pronounced the /r/ in the given words very prominently, that is, the /r/ is found to be rhotic in this study.

Importance of the Study in Bangladesh

Rhoticity is a feature of English pronunciation. As Bangladeshi people are now communicating with the people of the global village, they have to be familiar with both rhotic and non-rhotic accents of English for a better understanding and mutual intelligibility. They have to understand what the British or Americans say and at the same time, they have to be understood by others. The rhoticity plays a vital role in this case. Americans have the rhotic accent. On the other hand, the British have the non-rhotic accent. So, the findings of this research arevery useful to Bangladeshi speakers of English. They can learn how to pronounce the rhotic /r/ or the non-rhotic /r/ according to their needs. When they speak to the Americans, they require the rhotic accent whereas they need a non-rhotic /r/ when they speak to the British.

Conclusion

This paper investigates whether the /r/ in Bangladeshi English is rhotic or non-rhotic and finds that the /r/ is rhotic in Bangladeshi English. Although this study is carried out on a very small scale , that is, only on 25 tertiary learners of one university, it represents the general scenario regarding the pronunciation of the /r/ in Bangladeshi English as Bangladeshi EFL learners pronounce English sounds following the English letters. So, the study recommends that Bangladeshi EFL learners should learn both the rhotic and non-rhotic pronunciation of English /r/ as they have to deal with both Americans and the British in their future life at home and abroad.

References

Delattre, P. & D. C Freeman (1968).A dialect study of American r's by X-ray motion picture. Linguistics, 44, pp. 29-68

Lass, R. (1997). Historical linguistics and language change, Vol.81, CUP.

Lawson, E., J. Stuart-Smith, & J. Scobbie (2008). Articulatory insights into language variation and change: Preliminary findings from an ultrasound study of derhoticization in Scottish English. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, 14, pp. 102-110

Roach, P.(2009). *English phonetics and phonology: A practical course*. Cambridge University Press.

Trudgill, P. (1986). *Dialects in contact*. Blackwell.

Trudgill, P. (2000). *Sociolinguistics: An introduction to language and society*.Penguin, UK.

Villarreal, D., L. Clark, J. Hay, & K. Watson (2021). Gender separation and the speech community: Rhoticity in early 20th century southland New Zealand English. Language Variation and Change, 33, pp. 245-266,

Wells, J. C. (1982). *Accents of English*. Cambridge University Press.

Zhou, X., C. Espy-Wilson, S. Boyce, M. Tiede, C. Holland, & A. Choe (2008). A magnetic resonance imaging-based articulatory and acoustic study of 'retroflex' and 'bunched' American English /r/.The Journal of the Acoustical Society of America, 123, pp. 4466-4481.

O' Connor, J. D (1980). *Better English Pronunciation.* 2nd ed. Cambridge University Press.

Hooke, R. & J. Rowell (1982), *A Handbook of English Pronunciation*. Edward Arnold.

Jagannath University Journal of Arts
Volume 14, No 01, January-June 2024

Exploring the Impact of Bangladeshi Dialects on Linguistic, Facial and Behavioral Characteristics in Bangladesh

Protiva Rani Karmaker*

Abstract

This study investigates the intricate interplay between Bangladeshi dialects and the facial and behavioral characteristics of individuals across four districts, seeking to unravel the distinct correlations between language, mindset, beliefs, manners, cultural traits, and their connection to geographical and historical backgrounds. The study employs a mixed-methods approach consisting of both qualitative and quantitative methodologies. Accordingly, this study engaged 100 participants, evenly distributed across four districts. Also, employing semi-structured interviews with 6-8 individuals per district, and subsequent focus group discussions with 10-12 participants, audio and video recording techniques were utilized to capture nuanced vocal and facial expressions. The findings highlight that individual, despite sharing a common geographic location, exhibit unique speech patterns and behaviors. Notably, during video recordings, local participants displayed a sense of apprehension and shyness when communicating in their respective dialects. This research contributes valuable insights into the complex interplay between geography, dialect, and human behavior, shedding light on the need for a nuanced understanding of regional linguistic variations.

Keywords: Dialect, Language, Facial and Behavioral Characteristics, Cultural Traits, Bangladesh

1. Introduction

According to Edward Sapir (1921), “Speech is such a familiar feature of daily life that we rarely pause to define it. It seems as natural to man as walking" (p. 35). Human language is structured by subconscious principles that shape speech sounds and their patterns. Linguistics, as a social science, seeks to describe and understand language accurately within any speech community. Language is central to human affairs, influencing etiquette, ethics, and mythos, and serving as a conduit for transmitting these elements to future generations (Clark & Clark, 1977). Language, therefore, is crucial for understanding human nature (Chomsky, 2006). It reflects cerebral processes and influences the stream and character of thought (Chomsky, 2006). Much like hereditary traits are passed through DNA, language adopts various attributes based on its use in communication. Human physical traits are linked to place, time, and social settings, and linguistic features are similarly tied to geographical contexts. This connection is evident in the diverse dialects and localities, each characterized by unique lexicon, colloquialism, tone, and intonation. In Bangla, numerous dialects reflect distinct facial and behavioral traits.

* Professor, Institute of Modern Languages, Jagannath University, Dhaka

Linguistically, a dialect is a variation of a language specific to a particular region or social class.

Dialect, as a regionally or socially distinctive language variety, often separates groups sharing the same national identity through specific words or grammatical structures. Like genes, dynasties, families, societies, and culture, language shapes both explicit and implicit identities, highlighting unique survival traits (Rahman, 2019). Language use in speaking, writing, and reading is central to daily life and communication, reflecting the intrinsic human-language affiliation. Studying language usage—words and phrases people naturally adopt—reveals insights into human behavior (Shashkevict, 2019). Linguistics experts aim to define unique and common aspects of human language, its acquisition, and evolution influenced by age, culture, gender, and history, viewing language as an ethnic, societal, and psychological phenomenon (Shashkevict, 2019). Language significantly aids cultural diffusion, promoting stability and innovation by embedding character traits within a language-speaking community (Gelman & Roberts, 2017). Thus, language reflects its users' culture, with culture influencing both lexical variety and redundancy.

In Chinese culture, time is often discussed with specific gestures representing vertical, horizontal, or sagittal orientations. Gu et al. (2014) found that these gestures are influenced by language-specific conceptualizations and shifts in linguistic choices, both in production and perception. In Bangladesh, diverse dialects are spoken in regions such as Sirajganj, Pabna, Bogura, and Rangpur, each with unique linguistic characteristics like vocabulary, tone, intonation, and semantic meanings. These areas also have distinct social and cultural traits that reflect the behavior of their language users. The researcher chose an inductive approach for its ability to provide deeper insights into individual dialects, beliefs, and feelings, contrasting with a quantitative approach that is broader and more numerical. Observing and labeling language features, behaviors, and physiological aspects were key to the research. The goal was to analyze the geolinguistic associations in these areas to meet the research objectives.

However, this research has focused on the close relationship of language to the expression of inner mental events, which is also confirmed by the developmental approach. Piaget, notably among others, indicates the close correspondence between the development of certain conceptual notions in the child and the forms of articulated expression as these successively appear in the child's language. There is also considerable anthropological and cultural evidence to suggest that the habits of thought of various peoples are reflected in the structure of their particular language. (Lorenz, 1955)

The general objective of the research was to explore how we can discover and find out the distinctive correlation between the dialects of a language and the facial features of the people who are using it as they are born into, grow up with, speak, and communicate through it. This research includes the following key objectives:

- Finding out the distinctive correlation between a language and the behaviors of the people who are using it as they are born into, grow up with, speak, and communicate through it.
- Exploring the link between people's linguistic choices and features and their relationship, i.e., mindset, beliefs, manners, and cultural traits.
- Discovering the connection between people's geographical and historical backgrounds, and their psycholinguistic as well as social characteristics.

Literature Review

Liu et al. (2019) examined how human facial expressions are influenced by language context, suggesting that pictorial contexts where familiar faces are recognized provide relevant information for processing expressions. They also assert that language context, as a form of circumstantial evidence, significantly impacts facial expression. Baus et al. (2021) found that language acts as a social cue, influencing how individuals categorize others, which then affects face perception. The influence of dialect and regional accent is also noteworthy. Heblich et al. (2015) indicate that speaking in a specific dialect reveals one's social and cultural identity, whether consciously or unconsciously. Accents are tied to particular attitudes and stereotypes, which are also reflected in the community's general appearance and characteristics. Their research shows that people sharing the same dialect are more inclined to cooperate and exhibit liberal economic behavior, while those with different dialects tend to demonstrate discrimination and stricter economic attitudes. Jiang (2000) highlights that words and phrases in a language reflect deep-rooted cultural associations, demonstrating that language and culture are inseparable.

Busso and Narayanan (2007) explore the connection between facial expressions and speech, focusing on how diction and emotions influence this relationship. They analyze an audio-visual database where participants, with markers attached to their faces, read neutral sentences while expressing four emotions: neutral, sadness, happiness, and anger. Pearson's correlation was used to measure the relationship between facial and acoustic features. The study confirms a strong consistency between these features, showing that emotional content—such as anger, sadness, or friendliness—is reflected in facial expressions. The more intense the emotion, the more pronounced the facial changes. Over time, repeated emotional expressions can shape a person's habitual facial appearance. This study highlights the deep connection between spoken and non-spoken communication, with gestures and sometimes postures closely mirroring speech, influenced significantly by the emotional and dialectal aspects of the message (Busso & Narayanan, 2007).

According to Wardhaugh (2010), social dialects are explained through social groups, with factors like employment, income, ethnicity, and religion influencing speech patterns. Bangladesh exhibits significant dialectical diversity, with distinct accents, spellings, and pronunciations across regions (Chowdhury, 2018). The Bangla language demonstrates variations in phonology, morphology, syntax, and semantics (Faquire, 2020). Sunitikumar Chatterji, a prominent linguist, classified Bangla dialects into four groups: *Rarhi, Varendri, Kamrupi, and Vanga* (Faquire, 2012). An

acoustic analysis by Kibria et al. (2020) revealed that Bangladeshi native speakers possess varied accents and pronunciations influenced by their geographical locations.

This paper explores the concept of "dual dialects" in actor training, linking codified speech patterns (dialects) to habitual movements (physicality). It compares the acquisition processes of verbal and non-verbal communication in early childhood, discussing brain areas responsible for movement and language processing in adults. Drawing from kinesiology, sociolinguistics, and sociology, the research supports the idea of gesture and speech as a unified "multi-modal utterance." The study also considers how dual dialects might impact students from pluralistic backgrounds (Richardson, 2015). Darwin observed that primates had facial muscles and expressions similar to humans, leading him to suggest that facial expressions originally had adaptive functions. For instance, expressions of disgust, like a raised lip or wrinkled nose, could protect against pathogens, aiding survival. Darwin argued that these expressions are innate, evolved behaviors, with muscle contractions designed to regulate sensory experiences, passed down through natural selection (Darwin, 1872/1999).

Susskind et al. (2008) provide compelling evidence that facial expressions of fear and disgust modulate sensory exposure through specific facial movements. Using methods like statistical face modeling, psychophysics, and MRI, they found that fear expressions increase sensory intake by widening the eyes and flaring the nostrils, while disgust expressions reduce sensory exposure by blocking nasal passages and narrowing the visual field (Jack, 2013). Additionally, Lee et al. (2013) demonstrated that eye widening in fear also benefits observers, supporting evolutionary theories of facial expressions as adaptive biological functions before evolving into social signals (Shariff & Tracy, 2011). These findings are consistent with early theories on the biological origins of facial expressions and have historically led to a focus on universality in facial expressions, with minimal consideration of cultural factors in early studies (Feingold, 1914).

The Cultural Survey of Bangladesh (2007) identifies 16 regional varieties of Bangla spoken across districts such as Barisal, Bogra, Chittagong, Dhaka, and Sylhet, with Sylheti and Chittagonian being particularly distinct. Chittagonian is largely unintelligible to speakers of other dialects, creating a diglossic situation where standard Bangla is reserved for formal communication while regional varieties are used in daily life. In urban centers like Dhaka, Chittagong, and Sylhet, where diverse regional immigrants coexist, mutual intelligibility among different dialect speakers indicates linguistic accommodation in these settings. Additionally, languages spoken by indigenous people, such as Chakma, Tanchangya, Hajong, Bishnupuryia, and Oraon Sadri, have evolved from Tibeto-Burman origins to belong to the Indic group of the Indo-European families due to prolonged contact with local Bangla varieties (Faquire, 2009). The study of Standard Dialect (SD) ideology highlights how this concept influences linguistic behavior and beliefs, with a tendency to fetishize the 'standard' variety and stigmatize 'non-standard' varieties. Field data suggest that SD ideology manifests differently in rural versus urban areas of Bangladesh, reflecting varied linguistic attitudes among Bangla speakers (Hasan & Rahaman, 2014).

Methodology

This research adopts a mixed-method approach, integrating both qualitative and quantitative methods to enhance the study's procedural and result-oriented rigor. Hossain and Al Hasan (2023) highlight that "the qualitative approach is capable of evaluating psychological points of view, and quantitative information may provide a clear indication and percentage of the facts the researchers will be focusing on" (p. 111). Mixed-method studies emerged from the historical conflicts between qualitative and quantitative research tactics and have become widely used for their ability to offer diverse design options and concurrent strategies (Terrell, 2012). This approach helps to provide a richer historical context and deeper meaning to research issues (McKim, 2017).

In this case, qualitative research using induction was employed. Data was collected on a specific study area, from which concepts and theories were constructed (Conroy, 2010). A qualitative approach was chosen for its ability to provide deeper insights into individual utterances, beliefs, and feelings, contrasting with the more structured, broad, and numerical nature of quantitative methods. By observing and labeling target language speakers, their language features, and facial expressions, correlations between dialects and facial expressions were analyzed to meet the research aim.

Research Setting

The research focused on four northern regions of Bangladesh: Sirajganj, Pabna, Bogura, and Rangpur, known for their diverse dialects. These areas exhibit unique language features including vocabulary, tone, intonation, and semantics. Additionally, the original inhabitants display distinct social and cultural traits linked to their languages. My in-law's home in the north provided me with an intimate understanding of these linguistic, geolinguistic, social, cultural, and physiological diversities. Hence, the chosen setting was intentional, and the familiar attributes are expected to aid in achieving the research objectives effectively.

Population Sampling

The population for this study comprised randomly selected local people from Pabna, Sirajganj, Bogura, and Rangpur. Noor et al. (2022) state that "simple random sampling is a widely utilized sampling method in quantitative studies with survey instruments. It is asserted that simple random sampling is favourable in homogeneous and uniformly selected populations." I visited all these places very frequently during my vacation. There were a total of 100 people, consisting of both males and females of diverse ages, 25 from each district (25 people from each area = 25 x 4 = 100).

Data Collection

To conduct the research appropriately and fruitfully, I used interview and observation techniques. With regard to the interview, I interviewed 6–8 people from each area, regardless of their demographic background. Sometimes I have used a semi-structured interview script, and the interview session took place for 5–10

minutes with each respondent. Following, I conducted a focus group discussion where 10–12 people attended. In these two types of data collection procedures, I used both audio and video recording process so that I could collect their voice, tone, and intonation. Besides, I used video recording in order to understand and comprehend their facial expressions during their conversations. I have also added four case studies here. The research assistant collected ample samples from each area, through which I have obtained significant findings.

Data Analysis, Findings

For the purpose of research, several observations and interviews were conducted between January and June 2023 in four districts. The findings of the research have been discussed separately within four districts.

Linguistic differences between standard Bangla and different regions

Linguistic differences between the standard Bangla and Rangpur regions

From the findings, lexical differences between the standard Bangla and Rangpur dialects have been noticed. Here are some of the everyday words used in Rangpur dialect.

Standard Bangla	Rangpur Dialect	Standard Bangla	Rangpur Dialect
ছেলে chele (boy)	*ছাওয়া chawa* (boy)	*আমি ami* (I)	*মুই mui* (I)
মেয়ে meye (girl)	*বেটিছাওয়া betichawa* (girl)	*আমরা amra* (we)	*হামরা/মোরা hamra/mora* (we)
বলা bola (to tell)	*কওয়া kowa*(to tell)	*বলবেন bolben* (will tell)	*কইমেন koimen* (to tell)
মাঝখানে majhkhane(inside)	*ভেত্রে vetre*(inside)	*রেখেছিলাম rekhechilam* (kept)	*থুচনু thuchnu* (kept)

Table 01: Lexical differences between standard Bangla and Rangpur dialects (some everyday words)

S.L.	Standard Bangla	Rangpur Dialect
1.	*আমার ভালো লাগছে না। amar valo lagche na.* (I do not feel well.)	*মোর ভালো লাইগবেন্নাগছে না। mor valo lygbennagche na.* (I do not feel well.)
2.	*আমি বাজারে যাচ্ছি। ami bajare jacchi.* (I am going to the market.)	*মুই বাজার জাবান্নাগছ। mui bajar jabannagcho.* (I am going to the market.)
3.	*তুমি কোথায় বাসকর? Tumi kothay bas koro?* (where do you live?)	*কোন্টে থাকেন বাহে তোমরা? konte thaken bahe tomra?* (where do you live?)
4.	*আমাদের বাসায় এস। amader basay eso.* (Visit our home.)	*হামার বাড়িত আইস। hamar barit ayso.* (Visit our home.)
5.	*আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। ami tomake khub valobasi.* (I love you very much.)	*মুই তমাক খুব ভালবাস। mui tomak khub valobaso.* (I love you very much.)

Table 02: Sentence-level differences between standard Bangla and Rangpur region

S.L.	Standard Bangla	Rangpur Dialect
1.	*আমি ক্ষেতে কাজ করে খাই আমাদের বংশের সবাই কৃষক ছিল।*	*মুই জমিত কাম করি খাঁও, মোর গুষ্টির সবায় কৃষক আছিলো। Mui jomit kam kori khaw, mor gushtir sbay krishok achilo.*
2.	*বউ শাশুড়ী নিয়ে সংসার করি এটাই জীবন। অল্প ভাত*	*বউ শাশুড় নিয়ে সংসার করো, এইটেই জেবন, মিচছে*

	খেয়ে সুখেই দিনযায়।	*এ্যানা ভাত খায়া সুখত দিন যায় তাও। Bou shashur niye songsar koro, eitei jebon, micche eyana vat khaya shukhot din jay taw.*
3.	*অপেক্ষা করো কাজ শেষ করে আসি। বাসায় যেতে হবে।*	*এ্যানা অপেক্ষা কর, কাম শ্যাষ করি আইসো, বাড়িত যাবা নাগবে। Ayana opekkha kor, kam shyash kori aiso, barit jaba nagbe.*
4.	*ধীরে খাও, দৈ দেই তোমাকে।*	*আস্তে আস্তে খা, দই দেও এ্যানা তোক। Asteaste kha, doi deo aayana tok.*
5.	*কেমন আছো? কোথায় যাচ্ছো?*	*ক্যাংকা আছিস? কোটে যাওছিস? Kyangka achis? Kote jawchis?*

Table 03: Local vs. Standard differences in Rangpur district

From the discussion of Table 01 to Table 03, we can compare linguistic and behavioral features. If we compare the current language of Rangpur districts with standard Bangla, we will notice that the first person pronoun of Rangpur districts is different from standard Bangla as the standard word 'আমার' replaces মোর in Rangpur district, 'আমি' replaces 'মুই', 'আমাদের' replaces 'হামার', 'আমি' replaces 'মুই' etc. The changes in the jaw due to the different dialectal expressions of this region are also noticeable. Based on Skinner's behaviorism, we have seen affinity between people's faces while expressing dialects, affinity between their tempers, love for different local foods, cultural patterns, dressing, personalities, etc. All these findings also reflect a strong social tie among the people of Rangpur for their locality, dialect, heritage, and culture.

Linguistic differences between standard Bangla and Bogura region:

Bogra District, officially known as Bogura District, is a district in the northern part of Bangladesh. Bogura was a part of the Pundra Kingdom, which was an ancient kingdom in Bangladesh, or the Bengal region of the Indian subcontinent. It is also rich in heritage, farming, and dialects.

From the findings, lexical differences between the standard Bangla and Rangpur dialects have been noticed. Here are some of the everyday words used in Bogura dialect.

Standard Bangla	Bogura Dialect	Standard Bangla	Bogura Dialect
ছেলে chele (boy)	*বেটা ছৈল beta choil* (boy)	*আমি ami* (I)	*হামি hami* (I)
মেয়ে meye (girl)	*বেটি ছৈল* beti*choil* (girl)	*আমরা amra* (we)	*হামরা hamra* (we)
বলা bola (to tell)	*কওয়া kowa*(to tell)	*বলবেন bolben* (will tell)	*কবেন koben* (to tell)
মাঝখানে majhkhane(inside)	*মদ্দে modde*(inside)	*রেখেছিলাম rekhechilam* (kept)	*থুচলেম thuchlem* (kept)
একটু ektu(a little)	*এনা ena*(a little)	*কোথায় kothay* (where)	*কুটি/কুনটি kuti/kunti* (where)

Table 04: Lexical differences between standard Bangla and Bogura dialects (some everyday words)

S.L.	Standard Bangla	Bogura Dialect
1.	*আমার ভালো লাগছে না। amar valo lagche na.*(I do not feel well.)	*হামার ভাল লাগিচ্ছে না। hamar valo lagicche na.* (I do not feel well.)
2.	*আমি বাজারে যাচ্ছি। ami bajare jacchi.* (I am going to the market.)	*হামি হাঁটত যাচ্ছি। hami hatot jacchi.* (I am going to the market.)
3.	*তুমি কোথায় বাস কর? Tumi kothay bas koro?* (where do you live?)	*তুমি কুটি থাক? Tumi kuti thako?* (where do you live?)
4.	*আমাদের বাসায় এস। amader basay eso.* (Visit our home.)	*হামার বাড়িত আস। hamar barit aso.* (Visit our home.)
5.	*আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। ami tomake khub valobasi.* (I love you very much.)	*হামি তোমাক খুব ভালবাসি। hami tomak khub valobasi.* (I love you very much.)

Table 05: Sentence-level differences between standard Bangla and Bogura dialect

S.L	Standard Bangla	Bogura Dialect
1.	*আমি ক্ষেতে কাজ করে খাই। আমাদের বংশের সবাই কৃষক ছিল।*	*হামি জমিত কাম করে খাই। হামার বংশের সবাই কৃষক আছিলো। Haami jomit kam kore khai. Hamaar bongsher sobai krrishok achilo.*
2.	*বউ শাশুড়ী নিয়ে সংসার করি এটাই জীবন। অল্প ভাত খেয়ে সুখেই দিন যায়।*	*বউ শাউরি লিয়ে সংসার করি এডাই জীবন। অল্পেনি/ মিচ্চিনিভাত খায়ে সুখেই দিনযায়। Bou shauri liye songsar kori edai jibon. Olpeni/ micchinibhat khay esukhei din jay.*
3.	*অপেক্ষা করো কাজ শেষ করে আসি। বাসায় যেতে*	*হামার জন্যি এহানে থামো। হামি কামডা শ্যাষ করি আসিচ্ছি একসাথে বাড়িত যামুনি। Hamaar jonyi ehhane thamo. Hami kamda shyash kori ashicchi eksathe barit jamu*
4.	*ধীরে খাও, দৈ দেই তোমাকে।*	*আস্তে খাও, দৈ দেই তোমাক। Aste khaw, doi dei tomak.*
5.	*কেমন আছো? কোথায় যাচ্ছো?*	*ক্যাংকা আছু? কুথি যাচ্ছু? Kyangka achu? Kuthi jacchu?*

Table 06: Differences between standard Bangla and Bogura dialects

From the discussion from Table 4 to Table 6, we can compare **linguistic and behavioral features. I**f we compare the current language of Bogura districts with the standard Bangla language, we will also notice similar differences as in Rangpur. However, we will notice that the first-person pronoun of Bogura districts is different from standard Bangla as the standard word **'***আমার***'** replaces in Bogura district, **'***হামার***'**, **'***আমি***'** replaces **'***হামি***'**, **'***আমাদের***'** replaces **'***হামার***'**, etc. However, the researcher has also noticed some changes in facial expressions, like the changes in the strong jaw, due to the different dialectal expressions of this region. Based on Skinner's behaviorism, we have also seen affinity between people's faces while expressing dialects, affinity between their anger, temper, love for different local foods, cultural patterns, dressing, personalities, etc. All these findings also reflect a strong social tie among the people of Bogura for their locality, dialect, heritage, and culture.

Linguistic differences between standard Bangla and Pabna region:

From the findings lexical differences between standard Bangla and Pabna dialect have been noticed that similar differences are noticed between common pronouns, colloquial expression and behavioristic traits.

Standard Bangla	Pabna Dialect	Standard Bangla	Pabna Dialect
ছেলে chele (boy)	*চ্যাংরা chawa* (boy)	*আমি ami* (I)	*হামি mui* (I)
মেয়ে meye (girl)	*চেংরি betichawa* (girl)	*আমরা amra* (we)	*হামরা hamra/mora* (we)
বলা bola (to tell)	*কওয়া kowa*(to tell)	*বলবেন bolben*(will tell)	*কবেন koimen*(to tell)
মাঝখানে majhkhane(inside)	*মইদ্দে vetre*(inside)	*রেখেছিলাম rekhechilam* (kept)	*থুচিলাম thuchnu*(kept)
একটু ektu(a little)	*এট্টু ekna*(a little)	*কোথায় kothay*(where)	*কুটি kontekona*(where)

Table 07: Lexical differences between standard Bangla and Pabna dialects (some everyday words)

S.L.	Standard Bangla	Pabna Dialect
1.	*আমার ভালো লাগছে না। amar valo lagche na.* (I do not feel well.)	*হামার ভাল ঠেকিচ্ছে না। Hamar valo thekicche na.* (I do not feel well.)
2.	*আমি বাজারে যাচ্ছি। ami bajare jacchi.* (I am going to the market.)	*হামি হাঁটত যাচ্ছি। Hami hatot jacchi.* (I am going to the market.)
3.	*তুমি কোথায় বাস কর? Tumi kothay bas koro?* (where do you live?)	*তুমি কনে থাকো? Tumi kone thako?* (where do you live?)
4.	*আমাদের বাসায় এস। amader basay eso.* (Visit our home.)	*হামার বাড়িত আইস। hamar barit ayso.* (Visit our home.)
5.	*আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। ami tomake khub valobasi.* (I love you very much.)	*হামি তোমাক খুব ভালবাসি। Hami tomak khub valobasi.* (I love you very much.)

Table 08: Sentence-level differences between standard Bangla and Pabna

S.L.	Standard Bangla	Pabna Dialect
1.	*আমি ক্ষেতে কাজ করে খাই। আমাদের বংশের সবাই কৃষক ছিল।*	*আমরা মাটে কাম কইরে খাই। আমারে বংশের সবকামলা ছ্যিলে। Amra mate kam koire khai. Amare bongsher sob kamla achyile.*
2.	*বউ শাশুড়ী নিয়ে সংসার করি এটাই জীবন। অল্প ভাত খেয়ে সুখেই দিন যায়।*	*বউ শাউড়ি লিয়ে বাস করি। ইতুকয়ডা বাত খায়া বালোবাবেই দিন চইলে যায়। Bou shauri liye bas kori. Itukoyda baat khaya balobabei din choile jay.*
3.	*অপেক্ষা করো কাজ শেষ করে আসি। বাসায় যেতে হবে।*	*ইটু দেরি করেক, কাম সাইরে আসি। বাড়িত যাওয়া লাগবি। Itu deri korek, kam saire asi. Barit jaowa lagbii.*
4.	*ধীরে খাও, দৈ দেই তোমাকে।*	*ইটু দেরি করেক, কাম সাইরে আসি। বাড়িত যাওয়া লাগবি।* *Itu deri korek, kam saireasi. Barit jaowa lagbii.*
5.	*কেমন আছো? কোথায় যাচ্ছো?*	*ক্যাবা আছিস? কোনে যাইস? Kyaaba achis? Kone jais?*

Table 09: Differences between standard Bangla and Pabna dialects

From the discussion from Table 07 to Table 09, if we compare the current language of Pabna districts with the standard Bangla language, we will also notice similar differences as those of other districts. However, here we notice more differences in verbal expression between standard Bangla and dialectical expression. Regarding the facial expression, we get affinity like the changes in the strong jaw due to the different dialectal expressions of this region. Based on Skinner's behaviorism, we have also seen affinity between people's faces while expressing dialects, affinity between their anger, temper, love for different local foods, cultural patterns, dressing, personalities, etc. All these findings also reflect a strong social tie among the people of Pabna for their locality, dialect, heritage, and culture.

Linguistic differences between standard Bangla and Sirajganj region:

It has been observed from the results that there are lexical differences between the standard Bangla and the Sirajganj dialect. These distinctions also extend to common pronouns, colloquial expressions, and behavioristic features.

Standard Bangla	Sirajganj Dialect	Standard Bangla	Sirajganj Dialect
ছেলে chele (boy)	*গ্যাদা chawa* (boy)	*আমি ami* (I)	*হামি hami*(I)
মেয়ে meye (girl)	*ম্যায়াছাওয়াল maya chawal* (girl)	*আমরা amra* (we)	*হামরা hamra* (we)
বলা bola (to tell)	*কওয়া kowa*(to tell)	*বলবেন bolben*(will tell)	*কব্যান koben*(to tell)
মাঝখানে majhkhane(inside)	*মইদ্দে moidde*(inside)	*রেখেছিলাম rekhechilam* (kept)	*থুচিলাম thuchilam*(kept)
একটু ektu(a little)	*এইকন্যা eikna*(a little)	*কোথায় kothay*(where)	*কনে kone*(where)

Table 10: Lexical differences between standard Bangla and Sirajgonj dialects (some everyday words)

S.L.	Standard Bangla	Sirajganj Dialect
1.	*আমার ভালো লাগছে না। amar valo lagche na.* (I do not feel well.)	*হামার ফাইন ঠেকতিছে না। hamar fain thektiche na.* (I do not feel well.)
2.	*আমি বাজারে যাচ্ছি। ami bajare jacchi.* (I am going to the market.)	*হামি হাঁটত গ্যাতাছি। hami hatot getachi*. (I am going to the market.)
3.	*তুমি কোথায় বাস কর? Tumi kothay bas koro?* (where do you live?)	*তুমি কনে থাকো? Tumi kone thako?* (where do you live?)
4.	*আমাদের বাসায় এস। amader basay eso.* (Visit our home.)	*আঙ্গের বাড়িত আইস। anger barit ayso.* (Visit our home.)
5.	*আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। ami tomake khub valobasi*. (I love you very much.)	*হামি তোমাক খুব ভালবাসি। hami tomak khub valobas.* (I love you very much.)

Table 11: Sentence-level differences between standard Bangla and Sirajganj dialects

S.L.	Standard Bangla	Sirajganj Dialect
1.	*আমি ক্ষেতে কাজ করে খাই। আমাদের বংশের সবাই কৃষক ছিল।*	*আমি খ্যাতে কাম কইরা খাই। আংগোরে গুষ্টিহুদ্দা বেক্কেই কৃষক আছিলো। Angore gushtihudda bekkei krishok achilo.*
2.	*বউ শাশুড়ী নিয়ে সংসার করি এটাই জীবন। অল্প ভাত খেয়ে সুখেই দিন যায়।*	*বউ হাসুরি নিয়া সংসার করি, এইডোই জেবন। এদ্দুল্লা বাত খাই সুখেই দিন যায়গা। Bou hasuri niya songsar kori, eidoi jebon. Eddulla bat khai sukhei din jayga.*
3.	*অপেক্ষা করো কাজ শেষ করে আসি। বাসায় যেতে হবে।*	*দৈসো কাম হাইরা আইসি। বাইত যাওয়া লাইগবো। Doiso kam haira ayisi. Bait jaowa laigbo.*
4.	*ধীরে খাও, দৈ দেই তোমাকে।*	*ভারে খাও, দৈ দেই তোমাক। Bhare khaw, doi dei tomaak.*
5.	*কেমন আছো? কোথায় যাচ্ছো?*	*ক্যাবা আছাও? তুমি কোনেযাচ্ছাও? / কোনযাস? Kyaba achaw? Tumi konejacchyew?*

Table 12: Differences between standard Bangla and Sirajganj dialects

The same linguistic and behavioral affinity, as well as differences, have been noticed here. The dialectal versions for the word 'boy', *chele* in standard Bangla, from the four selected areas, Bogura, Rangpur, Sirajganj, and Pabna, of Bangladesh, as we can see in the tables, are *choil*, *chawa*, *chawal*, and *chera*, respectively. They are obviously pronounced in different ways, although their initial articulatory spot sounds the same. The unidentical pronunciations of the words have unidentical participations and movements of speaking organs like the tongue, gum, lips, and teeth, and they activate different airway mechanisms.

Findings from the case studies

Nahid Hosna lives in Garadoha, Sirajganj. Her husband is a famer. She has been living with her husband's family for the last 25 years in Garadoha. Her home town is known as the Shoratul region, nearer to Garadoha. She is afraid to visit her hometown now-a-days because of sudden quarrels and conflicts between local people and her brothers. She says, "I am living in peace here at Garadoha, Siraganj." She also said that there are dialectical and behavioral differences between the two regions of the same district.''	Md. Shoeb lives in Chelopara, Bogura. Her daughter is married off to Mr. Hasan, who lives in Gabtoli, Bogura. He never visits his daughter's house at Gabtoli. He says', "I did wrong to marry off my daughter at Gabtoli. People are different as well as their culture and dialects slightly". He also said that he is happy in his own town. And if possible, he will bring his daughter home to stay with them.
Case study: 01	**Case study: 02**
Imam Hossain is a local of Demra, Pabna. His only son has been living in Ishordi, Pabna. He is doing service over there. His son does not like to visit his place at Demra, as he thinks that Ishardi is more prosperous in terms of living standards and culture. There are also dialectical differences between the regions.	AfsaraTasnim lives in Rangpur. She likes to stay in Rangpur, the main town. All her relatives stay in different regions of Rangpur. According to her, there are ample differences in standard of living, living patterns, talking, and behaving between people of different regions living in Rangpur.
Case study: 03	**Case study: 04**

Facial and behavioral similarities between the users of different dialects from different localities:

While doing research, it was observed that there remains an affinity between facial expressions and behavioral activities among the people of Sirajganj, Rangpur, Pabna, and Bogura districts. In some cases, they are found showing the same expression while becoming angry and excited. Though the facial expressions of men and women were different, Between the four districts, there were affinities too.In some cases, some people were found hiding real facial expressions while doing research. Regarding capturing pictures and videos, most of them showed inclined.

Discussion

This research delves into the linguistic and behavioral distinctions among the Rangpur, Bogura, Pabna, and Sirajganj districts of Bangladesh, revealing significant dialectal and behavioral variations.

The findings highlight that each district exhibits unique linguistic traits compared to standard Bangla. In Rangpur, for example, replaces *'আমার'*, and *'মুই'* replaces *'আমি'*. Similarly, Bogura shows *'হামার'* for *'আমার'* and *'হামি'* for *'আমি'*. Pabna also presents its distinct lexical choices, and Sirajganj displays variations in common pronouns and expressions. These linguistic differences are not merely academic; they reflect deep-rooted regional identities and social ties.

Behaviorally, Skinner's behaviorism illustrates that dialects correlate with specific facial expressions and temperaments. Affinities in facial expressions, such as jaw movements, align with dialectal differences. These regional characteristics extend to cultural elements like local foods, dressing, and social interactions, reinforcing a sense of belonging and cultural heritage.

Case studies further substantiate these findings. Nahid Hosna's reluctance to visit her hometown due to conflicts underscores the impact of dialectal and behavioral differences within the same district. Similarly, Md. Shoeb's dissatisfaction with his daughter's marriage to someone from a different dialectal area and Imam Hossain's son's preference for Ishordi over Demra highlight the influence of dialectal and cultural perceptions on personal choices and relationships.

Overall, the research demonstrates that linguistic and behavioral traits are intricately linked to regional identity, affecting interpersonal relationships and regional cohesion. The observed affinities in facial expressions across districts suggest a deeper, shared cultural framework despite linguistic diversity.

Limitations

There are several notable limitations to this study. While conducting the interview, the researcher randomly selected people from each area, regardless of their demographic background. In this regard, the researcher has also conducted close talks with people for 5–10 minutes. Besides, video was recorded in order to understand and comprehend their facial expressions during their conversations. Moreover, the researcher also had a plan to take photos and use the voice recorder to

record the utterances of the sample sentences in their respective dialects with their tone and intonation, which will be taken and preserved with much care and attention. But unfortunately, very few agreed to take photos, especially the women, who were reluctant.

Conclusion

Language as the treasure house of any community lies from top to bottom at the level of human deeds, from the most significant to the most philosophical, and it is the transparent mirror that displays each and every community's established or long-practiced etiquettes, ethics, and myths, as well as works with beauty and heritage. Discovering the beauty of dialects in each community is the demand of the present time. This research will open other doors of unique study in this arena of correlating Bangla dialects with facial features and behavioral traits for future researchers.

References

Baus, C., Ruiz-Tada, E., Escera, C., & Costa, A. (2021). Early detection of language categories in face perception. *Scientific Reports, 11*(9715). https://doi.org/10.1038/s41598-021-89007-8.

Busso, C.,& Narayanan, S. S. (2007). Interrelation between speech and facial gestures in emotional utterances: A single subject study. *IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing, 10*(20), 1-16. https://doi.org/10.1109/TASL.2007.905145.

Chomsky, N. (2006). *Language and Mind*. Cambridge University Press.

Clark, H. H., &Clark, E. V. (1977). *Psychology and language: An introduction to psycholinguistics*. Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

Faquire, A. B. M. R. K. (2012). On the classification of varieties of Bangla spoken in Bangladesh. *BUP Journal, 1*(1), 130-139.

Gelman, S. A., &Roberts, S. O. (2017). How language shapes the cultural inheritance of categories. *Proceedings of the National Academy Sciences of the United States of America, 114(*30), 7900-7907. https://doi.org/10.1073/pnas.1621073114.

Gu, Y., Mol, L., Hoetjes, M., & Swerts, M. (2014). Does language shape the production and perception of gestures? A sudy on late Chinese-English bilinguals' conceptions about time. *Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 36*(36), 547-552. Retrieved from: https://escholarship.org/uc/item/0dn9m9m9

Hasan, S. M., & Rahaman, A. (2014). Standard dialect ideology in Bangladesh: A field study. *Language in India, 14*(10). 169-182.

Heblich, S., Lameli, A., & Riener, G. (2015). The effect of perceived regional accents on individual economic behavior: A lab experiment on linguistic performance, cognitive ratings and economic decisions. *PLoS ONE10*(2). 1-16.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0113475

Hossain, M., & Al Hasan, R. (2023). Educational technology (EdTech) in English as a foreign language (EFL) in Bangladesh: Necessities, innovations, and implications. *Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 11*(3), 102-129. https://doi.org/10.46687/NREO6623.

Jiang, W. (2000). The relationship between culture and language. *ELT Journal, 54*(4), 328-334. https://doi.org/10.1093/elt/54.4.328.

Liu, S., Tan, Q., Han, S., Li, W., Wang, X., Gan, Y., Xu, Q., Zhang, X., &Zhang, L. (2019). The language context effect in facial expressions processing and its mandatory characteristic. *Scientific Reports, 9*. 1-11. https://doi.org/10.1038/s41598-019-47075-x.

McKim, C. A. (2017). The value of mixed methods research: A mixed methods study. *The Journal of Mixed Methods Research, 11*(2), 202-222. https://doi.org/10.1177/1558689815607096.

Noor, S., Tajik, O., &Golzar, J. (2022). Simple random sampling. *International Journal of Education & Language Studies.1*(2). 78-82. https://doi.org/10.22034/ijels.2022.162982.

Rahman, M. M. (2019). Linguistic diversity and social justice in Bangladesh: A socio-historical and language ideological perspective. *Journal of Multilingual and Multicultural Development, 41*(3), 1-16. https://doi.org/10.1080/01434632. 2019.1617296.

Sapir, E. (1921). Language: An Introduction to the Study of Speech. *New York: Harcourt, Brace & World Inc.*, 33-35.

Shashkevict, A. (2019). The power of language: How words shape people, culture. Stanford. Retrieved from: https://news.stanford.edu/2019/08/22/the-power-of-language-how-words-shape-people-culture/

Skinner, B. F. (1974). *About Behaviorism*. Alfred A. Knopf Inc.

Terrell, S. R. (2012). Mixed-methods research methodologies. *The Qualitative Report, 17*(1), 254-280. http://www.nova.edu/ssss/QR/QR17-1/terrell.pdf

Jagannath University Journal of Arts
Volume 14, No 01, January-June 2024

Gender Identity in *Herland* and *Sultana's Dream*: A Comparative Study of Feminine Utopia

Shah Md Ariful Abed*

Abstract

In the early twentieth century, in contemporary times, two women writers from different parts of the world have written a narrative on the same subject, the desired 'society' for 'women'. American author Charlotte Perkins Gilman in her utopian fiction *Herland* builds a completely female-dominated society; where there are no males–even the inhabitants of that land are born without the biological relation of men and women. On the other hand, Bengali writer Begum Rokeya Sakhawat Hossain in her *Sultana's Dream*shows the inverse of men and women's relationship and role, where women take possession of men's role and they reign their new society successfully. Both authors challenge the patriarchal society of the old world highlighting the immense potential of women. This article examines how both authors create a feminine utopian society that challenge the existing male dominated world and portray women empowerment in two different cultural regions.

Keywords: Utopia, Feminine fiction, Herland, Sultana's Dream, Comparative Literature Gender Identity

The authors of *Herland* (1915) and *Sultana's Dream* (1905), Charlotte Perkins Gilman (1860-1953), and Rokeya Sakhawat Hossain (1880-1932), respectively were contemporary feminine utopian fiction writers. They illustrate gender identity in the early twentieth century. However, they were born in different cultures and geography. In their lifespan, although they did not meet or know each other, their objectives were quite similar. American author Gilman and Bengali writer Begum Rokeya depicted how women's capability can build a Utopian feminine society. They aim to create a society where women will get access to education, the right to live with no discrimination and enjoy the highest attainable standard of mental and physical health. Significantly, they wanted to create an alternative humanistic utopian world that manifested the new identity of women.

The old world is masculine, and women's equal rights and existence are not acknowledged here. In the early twentieth century, new intellectual thoughts in sociology, political science, anthropology, and psychology developed in American society. These new thoughts and notions influenced the existing patriarchy to change the attitude toward women. The feminist movement is slowly solidifying. At that time, Gilman lit a fire regarding the women issue; she imagined a separate world for women and challenged conventional patriarchal doctrines. Contemporary feminist thinkers, social reformers, and activists welcomed Gilman's approach.

* Associate Professor, Department of Bangla, Jagannath University, Dhaka

On the other hand, the Bengali society had no freedom for women. Amalendu De agreed that Rokeya fought for equality between men and women (27).She had an onerous restriction to speak about women's education. There was no personal choice or space for women and no right to live free. In addition, for Rokeya, being born into a Muslim family made it extremely difficult to write something regarding women's freedom and independent living. Albeit she ignored the restrictions of religious orthodoxy and the bloodlust of masculinity, she strongly advocated women's education. She realized that women's emancipation was not possible without education. As a result, Rokeya's *Sultana's Dream* is considered remarkably bold writing considering the social ambiance of the early nineteenth century in Bangladesh.

However, Gilman and Rokeya are contemporaries of different societies; they have tried to change patriarchal attitudes towards women by writing feminist utopian fiction. *Herland* and *Sultana's Dream* are protesting against all the misconceptions that women are physically weak, less intelligent, and incapable of becoming a part of the power. As a tool to criticise the current society, they constructed the plot by enclosing the house of the manless state in *Herland* and confined the men inside in Ladyland of *Sultana's Dream*. In *Sultana's Dream*, Rokeya wanted to awaken her fellow. She stated that although a wild animal is more robust than a man, this does not give him the power to rule the human race. By denying their self-confidence and respect, women have violated their obligation and have forfeited their inherent rights (6).

On the other hand, socialism greatly inspired European and American society in the late nineteenth century. Perkins Gilman was not interested in the class struggle, or revolution but was attracted to the common property of socialism. At the same point, Rokeya wanted women may take part in social activity and the economic sector. In both fiction, they portrayed that it could be possible to establish socialism on the old social system if the state was ruled by women. Gilman opted for "common interest" only for child rearing because "they discovered that the situation they were studying brought them into contact with an infinite number of people who shared their interests" (Gilman 128)." In *Herland*, Gilman offers women freedom regarding child-rearing. Motherhood is enough for women. By becoming a mother, women contribute to the national life significantly. Children nurturing is not her job. According to Gilman, children would be grown up through shared activities arranged by the authority (129)."

The current establishment (basically masculine society) wants to keep women inside the walls in the name of privacy and child-rearing. Gilman wants to break the stereotype of the traditional home concepts; she consider the concept of "family" to be more effective for society instead of "home". Gilman has shown the most interest in creating a universal family concept to raise children. In *Herland*, Celis (one of the female characters) utteredin favor of universality that 'we cannot live one place' (Gilman 120-121). In *Herland*, Gilman seems to have eliminated the subject of marriage. The women have been unfamiliar with the term marriage; they 'excluded

the marriage ceremony or service' (Gilman 145) for over two thousand years. Until three strangers (Ven, Terry, and Jeff) appeared in women utopian community (Gilman 152). It is awkward to accept the idea of building a family without marriage in some society because of the inheritance of wealth and identity crisis that could be clear how it would be distributed. Though, marriage system has complexityand is seen in some tribes and society but in later period, in western civilisation people are only concerned to giving birth the child and form a family without marriage. Gilman's basic concern was the child rearing rather than marriage, because she knew they are the future prospectsto her *Herland*.

"Marriage" acts as a kind of possession, which undermines women's freedom. Both Gilman and Rokeya point out that marriage is one of the main obstacles to establishing women's rights. Degler describes how women are deprived of the social power structure by the "marriage and home" concept; according to Gilman's "*Passing of Matrimony*," he states, "The social fiat that marriage and the home are the sole occupations of women, she pointed out, situations enormous pressures on girls. A man can have a home, a family, love, and companionship while remaining an "active citizen of his age and nation." The girl, on the other hand, "must 'choose'; she must either live alone, unloved, unaccompanied, uncared for, homeless, childless, with her work in the world as only comfort; or she must forego all world service in exchange for the delights of love, maternity, and domestic service (Degler 26)." Women were beginning to make other choices at this time, especially based around areas where they had greater professional opportunities and could remain in all female spaces whichcould be also revolved by sexuality.

Nonetheless, in the old world, a woman's physical appearance is considered as a symbol of weakness. Gilman illustrated in *Herland*, women as 'not built for heavy work' (Gilman 119).She considered it as the biological hierarchy of the contemporary society. Nevertheless, Gilman knew this idea is not reasonable or scientifically proven. Because, in the animal kingdom, subordination with physical strength is considered, but it does not apply to human beings at all. Both authors in *Herland* and *Sultana's dream* discuss how the woman's physical appearance or strength doesn't make any impact to do any work successfully. In *Herland*, Gilam illustrated how women work in the farmland, build new construction out of large stones, streets and houses in the town (Gilman 119). In the same way, in *Sultana's Dream*, women work in and out of home and office (Hossain 6). They overcome the 'lack of physical strength' by their brain (Hossain 10). The stereotypes of old world undermine the women power and their physical ability though mental ability is more needed to build a nation. Gilman and Rokeya both portrays the misconception of old-world regarding women physical ability.

Patriarchal society has long believed that women have little knowledge or interest in science. Gilman and Rokeya have exemplified the unprecedented advancement of science in the feminist realm to change such irrational thinking. Both authors have showed keen interest in science and reached the pinnacle of progress. Gilman

wrote:“Women currently know the different sciences, for instance, anatomy, physiology, nutrition, botany and chemistry. Besides, they are also eager to learn about history and psychology (Gilman 133).” The same situation was seen in the Bengal society. The men were against female education. In Bengal, women's education is not considered by any term: both social and moral “betterment” is consistently ignored by the current society until the twentieth century. Child rearing, domestic household works, and fulfilling all demands of a husband were women's primary duties in that period. In the colonial period, some educational institutions allowed admitting women. However, this society permitted "schooling" of women is not for the acquisition of knowledge; it rather for domestic life (Bannerji 51).

In Rokeya's Ladyland, the men's rule is just reversed; they are seen here doing housework, such as cleaning the kitchen and doing other household chores. Women are seen to do all the work outside. Women are skilled not only in outdoor work but also in handicrafts (Hossain 5-6). In Ladyland, ladies control all social issues; men are kept in the house to mind children and do domestic work and cooking (Hossain 11). This inversion shows women can do what men can, and men can do what women can; these are not dependent on the biological tasks.

Gilman noticed that women are oppressed by sexual identity. The concept of sex is the root of all social inequality of women. She asserted the natural superiority of the female sex both theoretically and fictionally (Mary A 523). Moreover, she applied Darwin's theory of evolution in the form of social evolution (Social Darwinism). In *Herland*, enthusiastically she endorses “parthenogenesis”. Sex like the animal kingdom is nothing more than a gender. She built a sexless society and changed the concept of sex. That is why Gilman exclude the wedding ceremony in her *Herland* (145).

In *Herland*, sex is divided into two kinds: love and helping others. According Gilman, women are not treated differently rather than a opposite sex. In *Women and Economics*(1898) she stated the meanings of "sex". However, regarding the word sex only uses against the women identity, Gilman pointed out in the "*Women and Economics*" that it is an entirely unnatural process, “--an erratic, and morbid action, making the sex –relation of humanity a frightful source of evil (14).”Thus, in *Herland,* Gilman showed the non-existence of sex. She stated “no sex-feeling to appeal to, or practically none. For many years disuse had left only little of the instinct (118).”Women in *Herland* desiderate the sex aim, as well as envy. They lacked the show off the power with other countries, no upper or middle class or thirst for wealth (Gilman 126).On the other hand, Rokeya wants to draw a traditional society in Ladyland. Although men have been portrayed sarcastically, she emphasises training and taming them (Hossain 5).

Gilman and Begum Rokeya both raised the question of moral obligations. In their feminine utopian fictional world, no sin or punishment are found. Although they were born and brought up in different cultures and region, both adored "humanism". Their goal was to create a humanity based society. They preferred to "love" all rather

gender division. The Herlandian, “developed their central theory of a Loving Power, and assumed that its relation to them was motherly—that it desired their welfare and especially their development (Gilman 141). Apart from this, Rokeya also puts emphasis on “love”. She drewa society where "Love and Truth" could be the principal moral obligation to maintain all (Hossain 12).

Nevertheless, both authors have given priority to education. Rokeya has focused on women's higher education. She has shown how the state has changed radically by making groundbreaking discoveries. In the late nineteenth century, women were not allowed to get educated through formal institution. Even the author Rokeya educated herself by a private tutor. In *Sultana’s Dream,* she depicts two central tertiary institutes where only women can study and do research for the better life forthe civilisation. For instance, the state has benefited immensely from the use of balloons to control rainwater and the invention of solar energy. Not only that but solar power is also used for the security and defense of the state (Hossain 8-9). Techno-scientific utopias that envision social well-being as nothing less than the improvement of the human condition itself challenge us to question their premises and reasoning (Rajan 45).

In the other hemisphere, Gilman alsoem phasises the importance of child education. She realise education is a continuous process that is significantly needed to build a harmonic society. Thus, she indulges in motherhood, which is considered the ‘highest social service’ (Gilman 93)in *Herland*. Gilman's concept of "race motherhood" (Katherine 423) and child-rearing was unprecedented in the society of twentieth-century America. Here it is worth noting that *Herland* explores the themes of eugenics. Motherhood—that erase the all racial controversy, such as no black-white deferences could divide the society. Gilman also advocated learning through play but no schooling (134). She was aware of and supported the Montessori method. The basic principles of the Montessori approach are collective space, playful learning, and self-directed study.

However, the opposite scenario of the old world is illustrated in both fictions. Such as, masculinity always exhibited the power which brought unrest to society. In *Herland*, kingship is diminished. In *Sultana's Dream*, after losing a battle, men were confined to 'Mardana' where once women were kept; called 'Zenana' (Hossain 6).Rokeya illustrates how the purdah (cover-up whole-body) system works and what men are now complaining against their seclusion. In Ladyland, they called the system "Mardana" instead of "Zenana" (Hossain 11). Rokeya brought to light the patriarchal society where women were kept inside the four walls. By this obstacle, women cannot contribute to their society at all.

The final sign of women's freedom is found in *Herland* by not keeping any pets. There are no domestic or pet animals; all are free; ‘no servants’; that is how Gilman symbolises women's freedom (169). It was a groundbreaking concept to establish an eco-balanced society where prevail animal right in that period.

Finally, Gilman portrays a single-racial feminine world. In her Utopian feminine fiction motherhood is recognised as the best contribution to the nation. Child-rearing belongs to the state's job. However, by creating a sexless society Gilman manifests

social Darwinism. These concepts give us some hints regarding the future advancement of civilisation. Nonetheless, Begum Rokeya illustrates a ladyland where women replace the men's possessions. In the women's reverse role, she exemplifies that women could contribute to society. Moreover, Rokeya demonstrates that biological comparison is a masculine discourse because the brain is more powerful than physical strength. In *Herland* and *Sultana's Dream*, although both feminine Utopian worlds have linear growth; they are well-shaped, and organised. However, the alternative female world looks like paradisiacal, it must have fallen apart because of the monotonous actions of its population repeatedly. To sum up, it is significant in the twentieth century to establish gender identity because as a feminine utopian fiction, *Herland* and *Sultana's Dream* challenge the old society.

Works Cited

Bannerji, Himani. "Fashioning a Self: Educational Proposals for and by Women in Popular Magazines in Colonial Bengal," *Economic and Political Weekly*, 26, No. 43, (1991): 51, https://www.jstor.org/stable/4398213.

Gilman, Charlotte Perkins. *Herland*, serialised in Forerunner, 6 (1915).

Gilman, Charlotte Perkins Stetson. *Women and Economics. A Study of the Economic Relation Between Men and Women as a Factor in Social Evolution* (2nd ed.; Boston, 1899.

Gilman, Charlotte Perkins. "Passing of Matrimony," *Harper's Bazaar*, June, 1906.

De, Amalendu. "The Social Thoughts and Consciousness of the Bengali Muslims in the Colonial Period." *Social Scientist*, vol. 23, no. 4/6, (1995): pp. 16-37. https://doi.org/10.2307/3520213.

Degler, Carl N. "Charlotte Perkins Gilman on the Theory and Practice of Feminism." *American Quarterly*, vol. 8, no. 1, Johns Hopkins University Press, (1956): 21–39. https://doi.org/10.2307/2710295.

Katherine, Fusco. "Systems, not men: Producing people in Charlotte Perkins Gilman's 'Herland'." *Studies in the Novel*, vol. 41, no. 4, The Johns Hopkins University Press, 2009, pp. 418–34, http://www.jstor.org/stable/29533951.

Gilman, Charlotte Perkins. *Herland*. United States: Pantheon Books, 1979.

Mary A,Hill. "Charlotte Perkins Gilman: A Feminist's Struggle with Womanhood." *The Massachusetts Review*, vol. 21, no. 3, The Massachusetts Review, Inc., 1980, pp. 503–26, http://www.jstor.org/stable/25089070.

Hossain, Rokeya Sakhawat. *Sultana's Dream*, translated by Barnita Bagchi. New Delhi (India): Penguin, 2005.It was first published in *The Indian Ladies' Magazine*, Madras, 1905, in English.

Rajan, Rajeswari Sunder. "Feminism's Futures: The Limits and Ambitions of Rokeya's Dream." *Economic and Political Weekly*, vol. 50, no. 41, Economic and Political Weekly, 2015, pp. 39–45, http://www.jstor.org/stable/44002713.

Jagannath University Journal of Arts
Volume 14, No 01, January-June 2024

Fanning Feminism : Fanon's 'necessary violence' in Nawal El Saadawi's *Woman at Point Zero*

Sharmin Afroz Shantu[*]

Abstract

The paper connects two distinct fields of Post-colonialism and Feminism through the perspective of Frantz Fanon and Nawal El Saadawi. With a focus on Saadawi's semi-fictional character of Firdaus, dehumanising tactics of oppressive structures are examined to reason Fanon's concept of "necessary violence" for decolonisation and liberation. The paper addresses concepts like "pathological alienation", "existential deviation" and "absolute depersonalisation" to draw a parallel between colonial and patriarchal frameworks. By recognising the inter sectionality of patriarchy, race, class, and colonialism, the paper strives to understand and critique oppressive ideological patterns and transcend rigid boundaries. The creation of subjectivity and politicisation of the body is seen as tools of subjugation and violently reclaiming one's agency and autonomy is considered a way to achieve Fanon's revolutionary humanism. The paper converges the two authors and their philosophical stances to highlight the impact of the Other on the practice of the self and the pursuit of dignity.

Keywords: Fanon, Saadawi, power, Feminism, subjugation, necessary violence, resistance, agency

Frantz Fanon has always been a contentious topic when it comes to his affiliation with feminism (Yokum 344, Brownmiller 251, Kalisa 4). While it is an undeniable fact that he cannot be called a staunch supporter or contributor to women's studies, one cannot essentially tag him as gender regressive if all his life's work can be given a proper analysis (Sharpley-Whiting in *Frantz Fanon. Conflicts and Feminisms)*.Fanon comes from an era where patriarchy was bluntly in fashion- a fact that is exhibited by his sexist and brutal criticism of Martiniquan author Mayotte Capecia in *Black Skin, White Masks* (Chancy 438, Emma 44, Nya 4), sporadic instances ofhis famous Freudian slips, and a notable lack of women's attempt to reframe Fanon's ideologies within the realm of feminism and ultimately reason for a more humanistic approach. The research tries to do so by attempting an unconventional pairing of Fanon's theories with the work of Nawal El Saadawi, especially via an analysis of her semi-fictional character Firdaus in the novel *Woman at Point Zero*. Although the pairing of post-colonialism and feminism may appear to be massively divergent fields, the paper argues that both the doctors, theorists, activists, and writers associated with these two realms of thoughts converge in their critique of oppressive persuasions, manipulative power dynamics and dehumanising tactics that are foundational to structures of subjugation. A close reading of El Saadawi's novel reflects a trail of tyranny that Fanon fought against all his life -a

[*] Assistant Professor, Department of English, Jagannath University, Dhaka

tyranny that boxed him and his racial-alikes under "sub-human" categorisations, but only through the lens of gendered violence. The novel in question projects a narrative portrayal of Fanon's idea of "necessary violence"(in its myriad of meanings) for the process of "decolonisation"/freedom for both the protagonist of the novel Firdaus and the author alike. A literature review of the existing scholarship is too sparse, but what is found also calls for the importance of this paper's thematic arguments. "A liberated society is founded upon awareness of the conditions of general subjugation, with a need to reveal the specific forms of violence that women are subjected to" (Vićentić 28). Here, the author also relates anticolonial and feministic themes in the paper to illustrate how patriarchal patterns become the last vestiges of colonial presence persecuted by colonising woman's bodies. The paper argues that the trauma created in the process perpetuates the cycle of violence. Recognising and addressing such structures is needed to achieve true liberation and a step towards ending the cycle of violence. Francesca Coin also discusses Saadawi's novel in light of Fanon's philosophy in her research. The author praises Saadawi's attempt to use the power of literature to bring forth the plights of the oppressed women. The paper contends that just like Fanon, Saadawi uses her tool of storytelling to "give voice to the silent ones and make visible the invisible" (433). The ultimate goal is indeed political and calls for solidarity and resistance in search of agency. The present paper takes the literature forward by adding new thoughts and arguments to the discussion.

Bridging Fanon and Saadawi: Reading Feminism as a Revolutionary Process

Liberation of women was not essentially considered to be Fanon's calling in life and that is not why his name is remembered. His canonical thoughts on the subjugation of the then-colonial Black mind and bodies is what defined his life's work both as a theorist and an activist. Acknowledging the fact that he missed his chance to engage in a defined work for women's liberation in a patriarchal paradigm, one has to agree that a progression into his later works finds him to be more tolerant than his handling of women's psychology in *Black Skin, White Mask* and to be more enlightened about the importance of the other half of the race in the process of decolonisation in *A Dying Colonialism, The Wretched of the Earth,*and *Toward the African Revolution*. Despite the blatant and abrasive anti-feminist signifiers of his writings, the paper invokes that Fanon, whose discourse critiqued the domination of both men and women against colonial discrimination, was fighting to pacify oppression not under an ideology of selective perception but for all genders. He was fighting to liberate his "non-white" comrades who, being filed under such categorisation were automatically conditioned to be non-human or sub-human. His interactions with lived experience of the female gender is most pronounced in chapters like 'Algeria Unveiled' or 'The Algerian family' of *A Dying Colonialism*, where he recognises the plight of women under both the patriarchal and colonial rule. Feminists like bell hooks who choose to 'leave Fanon behind' might have eased upon their judgement under the light of these chapters. The underlying cause for Fanon needing elongated justifications is that he was fundamentally misogynistic for most of his life. The reason why he is considered for feministic research is not for the aim of cherry-picking his voice for feminism but because of his ideological standpoints against tyranny. Concepts such

as "pathological alienation", "existential deviation" and being in a "state of absolute depersonalisation" are the story-line of the female experience in the patriarchal as well as the colonial interface. Women like Nawal El Saadawi have spent their entire lives combatting such cultural, political, social, and religious persecutions. El Saadawi is an extremely inspiring personality who is known for her audacity to voice out thoughts against unwavering traditions that not many in her situation dares to. She was fired from her job as a doctor in the Egyptian Ministry of Health for her book titled *Women and Sex* where she talks about FGM (Female Genital Mutilation).El Saadawi herself went through clitoridectomy when she was young and she was marked by the government because she made connections between the vile tradition and the country's political and economic repression in her book. The magazine she founded and edited, titled *Health*, was shut down. She was restrained under the rule of President Sadat, accused of apostasy, and heavily criticised for her statements against 'veiling', religious pilgrimage (Hajj), and America's war against Afghanistan, to name a few. Beyond these, she created voices like Firdaus in her authored works, who exemplify the condition of women against the wall of patriarchy and imagine them to be breaking down those cages.

"Individuals committed to feminist revolution must address ways that mencan unlearn sexism"(hooks77). The plight of today's women may have been the reality of Fanon's time when he was striving to "unlearn how to be colonised". Fanon gives his interpretation of the twisted subjection of relationships where he criticises both the colonised men and women- accusing them of their wish to "turn white" when they are committed to an interracial relationship.

> Out of the blackest part of my soul, across the zebra striping ofmy mind, surges this desire to be suddenly *white*. I wish to be acknowledged not as black but as white. … By loving me she proves that I am worthy of white love. I am lovedlike a white man. I am a white man. … I marry white culture, white beauty, white whiteness. When my restless hands caress those white breasts, they grasp white civilization and dignity and make them mine. (*Black Skin*63)

This monologue might have been the inner cry of a black man's desire to be wanted by a"white woman", to be "loved like a white man" and ultimately have enough authority over that "white woman" to feel like or be equal to a "white man". Thus, (ignoring the obvious patriarchal note here) in due course, not only be loved by white men but also be considered a human. Fanon critiques Capecia's interracial relationship in *Black Skin, White Mask*on account of the white man's desire to confine the colonised woman's sexuality and financial independence to eventually demarcate their power over the colonised black man. Fanon calls this kind of love to be a *perverse* one that ultimately cannot form a psychosexually healthy bond. It takes generations to "unlearn how to be colonised" and we are not yet near to "unlearn[ing] sexism". Fanon articulates that the tradition of racism has left a "massive psycho-existential complex" (5) in the mind of people and by analysing it, he believes he will destroy it(12). The "psycho-existential complex" in the experiences of women does not diminish their problems as well. Fanon recognises the feminist trials under both colonialism and patriarchy when he analyses the "battle of the veil"(47) in "Algeria Unveiled". Both Nawal El Saadawi and Fanon hold

opinions on the concerns of *veiling* of Muslim women in their writing and the reason why these cultural theorists are relevant even today is that we keep coming back to the same rhetoric of "niquab" or "hijab" year after year and because we, ourselves, are undecided on our anti/colonial or anti/patriarchal aversions.

> The Algerian woman, in the eyes of the observer, is unmistakably "she whohides behind a veil."…The officials of the French administration in Algeria, committed to destroying the people's originality, and under instructions to bring about the disintegration, …, were to concentrate their efforts on the wearing of the veil, which was looked upon at this juncture as a symbol of the status of the Algerian woman….At an initial stage, there was a pure and simple adoption of the well-known formula, "Let's win over the women and the rest will follow." ...This enabled the colonial administration to define a precise political doctrine: "If we want to destroy the structure of Algerian society, its capacity for resistance, we must first of all conquer the women; we must go and find them behind the veil where they hide themselves and in the houses where the men keep them out of sight." (*A Dying Colonialism*36-37)

Fanon's criticism of the French colonisers' treatment of the veil was based on their strategy of situating the veiled women to be a crucial symbol of Algerian tradition. An invasion or unveiling of these "veiled women" would connotatively mean denouncing Algerian men, their authority, and in extension, Algeria. In the battle for racial superiority, the woman's body is both politicised and fetishized in the gaze of the colonisers. In an attempt to relinquish the Muslim women from their "sadistic and vampirish"(62) possessors, the French administration took upon themselves as their occidental responsibility to free them enough, to teach the women new ways of *being* so that they could almost fit into their kind! Fanon expresses, "The white man is sealed in his whiteness. The black man in his blackness" (*Black Skin*11). There is this visible wall that neither the black could cross nor the female gender- no matter how many laws are put down or how sophisticated they become by adapting to the colonisers'/masculinists' culture. El Saadawianalyses the concept of a female body being a site of political struggle under the oppression of patriarchy and has been a strict advocator against veiling all her life. But she regards nakedness and veiling as two sides of the same coin. "No one criticises a woman who is half-naked. This is so-called freedom, too. The problem is our conception of freedom. Men are encouraged neither to be half-naked, nor veiled. Why?"'(Cooke par. 21).

Fanon and Saadawi dealt with oppressive power structures both in their lives and narratives. The fact that both their work is situated in a cultural and historical context gives us the possibility of a potential connection where the specific manifestations of oppressive power structures and their contestations/resistance can be questioned and analysed. Recognising the various systems of power and the intersectionality of multiple oppressors in action: colonialism, class, and race for Fanon and patriarchy, class and gender for Saadawi, the paper operates to decipher the process of dehumani sation of the "other" and the psychological effects of such dominations. Judith Butler in her book *Gender Trouble* conceives gender to be a thing that we 'perform' (50) and not something that we actually *are*; it is not a noun, but a verb, a costume that we choose to don as our identity. The confusion then purely lies in the contradiction of the

costumes and the fundamentals that people assign behind them. What then is the truest costume that one should avail to avoid being a pawn in someone else's war? The formulation of the subject formation and the politicization of the "body" is indeed a topic worthy enough for discussion if we are to critique essentialist notions of normalised yet oppressive ideological patterns and the need to transcend rigid boundaries.

Fanon and *Woman at Point Zero*: Formation of Subjectivity

Impact of the Other

"The Other is the locus from which the question of the subject's being is articulated" (Lacan 671). Jacques Lacan's contribution to psychoanalytic theory studies a dialectic between the self of the subject and the big "Other". The concept of the Other, embedded in Lacan's symbolic order, assumes a separate entity that precedes, structures, and conditions an individual subject. It is the locus from which we derive language, social and cultural norms, and even notions of almighty deities. The "question of the subject's being" is thus not an innate process that an individual comes to experience. The articulation of their identity, needs and sense of being is mediated by the intricate structures of the Other. The intriguing aspect of the Other is that of its phantasmic presence. It is not a single person, nor a collective of actual beings. Yet, it is a hypothetical eye, an observer for which the subject performs. The Other, thus, constitutes a site of immense power and control.

Peter Hudis writes about Fanon's assessment of the acceptance of the identity given by the white man-

> …. consciousness is not a free-floating signifier but is inseparable from the bodily-schema… The gaze of the Other has fixed me into this bodily-schema, but I am not merely an object. I am an *embodiedsubjectivity* that can act, move, and think—I do possess free will, evenin being treated like an object, or being objectified. Your gaze has robbed me of my freedom, but I can only be robbed of something that I *have*.(Hudis51)

Fanon has fought to be free of the "embodied subjectivity" by combatting against the racial structure throughout his life. He is even seen to be uncomfortable about "negritude" which celebrates black identity because ultimately his vision is not only to be recognised only as a black man or an Algerian man but to pave the way for humanism. The focus, then, is not the end goal, but the journey it self needs to contest subjugation, the need to be self-aware, and the need to create a concrete *subjectivity*, which will eventually install the magnitude of the achievement. "I am made of the irrational; I wade in the irrational" (*Black Skin* 123). Thisquote itself rationalises the need for the current combat for feminism as well. We have not yet achieved an uncontested format of subjectivity that we can perform or essentially *be* without being pawned by external forces. Sartre claims in *Being and Nothingness* that humanity is not a priori in essence and we are formulations of our interactions with others. We exist under the gaze of the Other and are defined by how the Other perceives us in a particular society. The black man is "the eternal victim of an essence, of an appearance for which he is not responsible"(*Black Skin*35). He is

subject to infantilization, primitivization, de-civilization, or sexualization. Just like a female identity that is subject to sub-human categorization as well-either infantilised, sexualised, or considered neurotic in response to every facet of her existence. Fanon claims that the "Arab [is] permanently an alien in his country [and] lives in a state of absolute depersonalisation… A society that drives its members to desperate solutions is a non-viable society, a society to be replaced" (53-54).

We find Nawal El Saadawi author of such characters "in state of absolute depersonalisation" in her semi-fictional novel *Woman at Point Zero*. The protagonist had to swim through an environment that was completely unaccommodating to her existence. Fanon talks about "racial epidermal schema" (*Black Skin*112) of the black man that fragments and denounces his way of being. "I am being dissected under white eyes, the only real eyes. I am fixed…they objectively cut away slices of my reality. I am laid bare" (116). Fanon conceptualises the black experience with a rather Sartre-an notion of "over determinism", elaborating the black being to be "over determined from within"(when one internalises the notion of their subservient self) and "over determined from without"(when one is defined by the stereotypical significations of their body). Firdaus has been brought up in a society of constant patriarchal panopticism. *Gaze*is a common motif along the narrative of the novel- criticising, correcting, and coercing every one of Firdaus's movements. In the world of masculinist overpower, just having the female body concentrates the gendered being into their genitalia and she becomes a symbol of her sexuality- with or without consent. She is prescribed a certain mode of behaviour, a certain boundary of life, and a regulated template of existence to live by where she is "pathologically alienated" in a society that is ready to punish her at every dissension. *Eyes* followed her everywhere in her life: "superintendent of the boarding school…inspect[ing] the way we studied…the way we slept or dreamt" (Saadawi32), the eyes of potential rapists in the street when she ran away- "In the dark I suddenly perceived two eyes, or rather felt them…They dropped their gaze with slow intent down to my shoes…then gradually started to climb up my legs, to my thighs, my belly, my breasts, my neck and finally came to a stop, fastening themselves steadily in my eyes, with the same cold intent" (43), the eyes of her husband as she ate every bite of food, the judging eyes of the school's principal calling her absentee family, etc. The only kind of gaze that was absent in her life was the empathetic one. She narrates a recurring dream-like sequence of "eyes of her mother" that watched over her. She saw the same eyes in Ms. Iqbal, her teacher, and Ibrahim, her love, but their transience in her life might be the reason why she is challengingly "over determined from within" and "without".

Persecuted Body

The concept of clothing is a controversial ideain the realm of feminism. The female body has been veiled and unveiled, clothed, and unclothed for the sake of politics, religion, or cultural dissensions for generations. In sessions of conflict, the female body stops being just its corporeal flesh and blood, and ironically becomes the centre of power and a symbol of an ideology that can be contested. Fanon elaborates at length on the colonial ideology assigned to the body of the Algerian women in *A*

Dying Colonialism. The coloniser's gaze saw "the veil [to] hide a beauty" (37) and accounts for the fantasy of the harem where the exotic figures present themselves in an Oriental heaven with multiplied women at every corner. "The European always dreams of a group of women, of a field of women, suggestive of the gynaeceum, the harem-exotic themes deeply rooted in the unconscious." (46). The dream also connotes for colonisation, as the *pillaging* of the women becomes a metaphor for the invasion of the virgin territory and an act of overshadowing the previous dominators of the female body.

> …the rape of the Algerian woman in the dream of a European is always preceded by a rending of the veil. We here witness a double deflowering. Likewise, the woman's conduct is never one of consent or acceptance, but of abject humility. Whenever, in dreams having an erotic content, a European meets an Algerian woman, the specific features of his relations with the colonized society manifest themselves. These dreamsevolve neither on the same erotic plane, nor at the same tempo, as those that involve a European woman. (45-46)

The process of unveiling the Algerian women leaves the Algerian man naked and strips off his power. When the colonised man tries to assimilate, he is then subject to "existential deviation" and Fanon dubs this as "cultural destruction". Saadawi decides to unveil her protagonist Firdaus in an empowering move. Just as the French have misunderstood the power of women in the colonised Algerian society, Firdaus's voluntary choice of prostituting her own body is an act that was equally unnerving to her oppressors. They did exactly what the men wanted but without the "abject humility" and ulterior motives that served the purpose of their selves. For Algerian women, it meant creating enough disturbance on the cultural thread, for the society to realise them as active militant members. They have been part of the liberation movement long before their 'unveiling' as 'guerrilla guides, nurses, cooks, washerwomen, seamstresses and secretaries' (Lucas 273-274) but has only been titled as helpers, when the same jobs gave their male counter-parts the pride of being militants. For Firdaus, it took an act of reclaiming her body and gaining financial affluence using exactly the way the men/women around her has been doing in the course of exploiting her. The fact that she could do that without a male authority and do it well, while at the same time observing a level of power over the male environment, is a concept that was severely intimidating for the patriarchal psychology.

Fanon seeks to reason for the inferiority complex that the colonised *self* suffers from and marks it to be economic and political discrimination that halts the colonised from flourishing socially and psychologically. Since the self is created under the constant gaze of the Other, it is the sub-human treatment of the self that seeks a proper acknowledgment from the Other. The lack of such recognition creates a desire in the self that affects his/her dignity and sense of esteem, to the point that it becomes fixatedon the Other, and tries to reform oneself to the likes of it. The less dignity and social appreciation one is given, the more fixated he/she becomes. This reasons for the black's decision to assimilate and adapt to the coloniser's way of being, even if that means opposing and denying his/her own culture, traditions, or purpose of being.

The character development of Firdaus portrays her to be the perfect candidate for analyses. The familial structure resembles closely with the social structure that Firdaus experienced around her. In a perverse form of Electra Complex, she is seen to form an affinity towards the socially recognised form of power that is most accessible to her. She felt love for her abusive uncle: "My face buried in his arms, I wanted to tell him that I loved him, but the words would not come" (Saadawi21); her teacher Ms. Iqbal: "It seemed to me as though I reached out in the dark and took her hand, or that she reached out in the dark and took mine hand. The sudden contact made my body shiver with a pain so deep that it was almost like pleasure, or a pleasure so deep that it was bordered on pain" (33) and the love she felt for Ibrahim, the humanitarian and the revolutionary, that made him the first person she trusted enough to be open to.

Need for Dignity: "Distorted Mirror" and "Absolute Self"

Firdaus literally "masked" herself and hid behind layers of make-up to cover her inferiority complex and assimilate herself in the strain of resembling the respected women of the society and being treated with a minimum level of dignity. "But because I am a woman I have never had the courage to lift my hand. And because I am a prostitute, I hid my fear under layers of make-up. Since I was successful, my makeup was always the best and the most expensive kind, just like the make-up of respectable upper-class women"(10). French colonisers devised and worked their strategies by dispersing white women into Algerian land to liberate the Algerian women from oppressive patriarchy and adopt the French mode of living and *be free* like the white women. Fanon criticised the relationship depicted by Mayotte Capecia indicating that she favoured the biracial relationship by making economic connections where the white man represented the power of affluence that the black so desires. Firdaus clearly fell under such influences as well until the day she realised the power of money in society, and her ability to take control of the instrument, her body, that has been earning for others all her life. The condition presented itself to the new Algeria in "Unveiling Algeria" with the new template of women (more active, more powerful than ever before), that influenced the need to create new rules for the new age, only to fall back upon newer forms of patriarchy. The problem with fixation, and accepting and adapting a faulty paradigm like patriarchy is that it does not work for women in the same way it works for men. This is the "distorted mirror" shown to the colonised that reveals the essential truth- that the world presented by the coloniser can never be truly theirs. Firdaus's educational degree will never be of any value in the oppressed world she lives, in the way a man's will. Nor will the new-found economic independence she achieves prove fulfilling, as it failed to reinstate her dignity or permit herany reasonable attempt to create a meaningful subjectivity for herself. That's why when Di'aa, one of her clients, held up another instrument of the oppressive tactic-the moral standard of the society, Firdaus could not take it. His words did more damage to her *self* than any physical pain she ever endured because it showed her a glimpse of that "distorted mirror". "The veil was torn from my eyes" (78).In search of her self-esteem, Firdaus leaves prostitution and gets a job as an office- assistant, only to realise that the

requirements of the new life are one and the same- what she used to do before, just with minimal material privileges.

> After I had spent three years in the company, I realised that as a prostitute I had been looked upon with more respect, and been valued more highly…My body was never hemmed in by other bodies in the bus, nor was a prey to male organs pressing up against it from the front and behind. Its price was not cheap and could not be paid by a mere rise in salary, an invitation to dinner, a drive along the Nile in somebody's car.(82)

Every time Firdaus runs away, she learns new facets of patriarchal bias that she may never be able to avail.

In the quest for a stable subjectivity, besides economic independence, Fanon evokes Hegel and his *Phenomenology of Spirit* for the construction of a sustainable self. In the "voyage of discovery" the self passes through multiple phases of *conciousness, self-conciousness, reason, spirit, religion,* and finally *absolute knowledge*. Firdaus passes through the stages seeking to fulfill the lack/desire to attain the *absolute*. She attains her *consciousness* as she moves to free herself economically, and *self-consciousness* as she realises that her self-worth relies on the recognition process from the Other. In Firdaus's narrative one can observe the muted world around her and the only pieces of conversations that she speaks of are the ones with her friend in boarding school, Ms. Iqbal, the female colleagues in her workplace, etc. who show little yet genuine concerns/recognition for her *self* that is meant to satisfy her need for dignity. To attain the *absolute*, only a measly admission of equality is not enough. In that case, merely acknowledging that the white French colonist is equal to the black Algerian colonised would have been enough. In the same way, just professing love to Firdaus by either Ibrahim or Marzouk, the pimp she kills, was not enough for her *self* to form stable subjectivity. In Hegel's *Phenomenology of Spirit,* the struggle to *self-consciousness* seeks to negate or overpower the Other. This is where Hegel elucidates his famous master-slave dialectic. In terms of the master-slave dialectic, Firdaus is met with a wall of continuous patriarchy in the face of her father, uncle, Fawzy, Ibrahim, Bayoumi, the rapist-police, Marzouk, and even Sharifa, the pimp who introduces her to the world of prostitution. The oppressive patriarchy put up a notion of independence in their position of mastery and the need for the slave's dependence upon the masters, where the position of Firdaus/slave need not be appreciated.

> [Firdaus]-"In that case, I want to be one of the masters and not one of the slaves."
>
> [Marzouk]-"How can you be one of the masters? A woman on her own cannot be a master, let alone a woman who's a prostitute. Can't you see that you're asking for the impossible?" (Saadawi104)

In the process, Firdaus became more aware of her *self* and her relationship with the masters to realise her indispensable position in the dialectic. She realised that her economic independence bought her the honour that she was seeking in society. "The court decided I was an honourable woman. Now I had learnt that honour required

large sums of money to protect it, but that large sums of money could not be obtained without losing one's honour" (99). She also discovered how a range of respectable men of "different professions [were becoming] immensely rich at her expense" (103). Fanon at the end of narrating Hegel's dialectic, comments that- "But the black man does not know the price of freedom because he has never fought for it" (*Black Skin*195). Fanon stresses the formation of the subjective via a process of active cleansing of the oppressors more elaborately in *The Wretched of the Earth*.

Woman at Point Zero: Attestation of Fanon-ian "violence"

"Decolonialisation is always a violent phenomenon"(*The Wretched*35). In Fanon's dialectic of violence, "[a]t the level of the individual, violence is a cleansing force. It free[d] the native from his inferiority complex and from his despair and inaction; it [made] him fearless and restore[d] his self-respect" (94).Fanon opts for violence as a potential measure and a response against extreme oppression. In its subdued version, the performance of violence can be in the form of challenging traditional and essentialist notions of subjugation. This symbolic assertion of the humanity of the oppressed is a process of creating agency and autonomy of the self. Refusal to accept tyranny/mistreatment is also a psychologically violent actand resistance would disrupt the continuous cycle of abuse. The first time Firdaus says 'NO' to a request of a client is tremendously liberating. The act of reclaiming back her body was a violent decision in the interface of a male-driven society. When categorising the development of a girl in Algerian society, Fanon mentions the concept of a "child-women" where the girl-child misses out on her experiences of psychological development of puberty and remains under the guardianship of the parents and is then married off (106-107). The revolution in Algeria paved the way for the violent birth of the "woman-for-action" and away from the identity of "women-for-marriage"(108). They recognised their worth in the process and strived for "women's decolonisation" against colonial and patriarchal structures. Firdaus found her new identity with her first "no" and became the *women-who-speaks*. Accepting the male rhetoric of "life is a snake" (Saadawi57) she assumes to strive for the *absolute* to reclaim control over her decisions about her life, thus opting for agency and autonomy.

"There is nothing more neurotic than contact with the irrational" (*Black Skin*75). When Fanon embraces the neurotic society, he does so with the understanding that the society,fixed in its irrational ways, is not to be conversed with logic. Thus, the problematic rhetoric of colonisation/patriarchy is bound is produce neurotic results to achieve freedom. Fanon's idea of violence in a much graver version is corporeal and heavily controversial. A messy process like decolonisation cannot happen through diplomatic discussions. A radical change requires sweeping revolutions that has the ability to upset the power dynamic and bring about the actual violent dismantling of essentialist structures. This category of violence would be destructive, liberating, and finally restorative. Nawal El Saadawi imagined characters like Firdaus to create discomfort in the system of male oppressive super-power. Maybe it is time to speak

up and break the silence and say 'no' to tyranny; maybe it is time to violently break down stereotypes. Firdaus identifies her reason for hating the men in her life- their positioning as the superior beings in the gender spectrum that gave them a sense of automatic authority and security; a right to play God with the lives of programmed slaves all around them, straining to solve their needs at every-beck-and-call while remaining silent and unseen themselves. This boost of self-esteem is pedestalled over some of the greatest bluffs that turn the world and patriarchy's fear lies in someone calling their game. Being brought up under the faulty and systematically repressive practices of patriarchy resulted in Firdaus's fixation on abhorring 'men' and thus, an act as irrational as murder made complete sense in her mind.

> I was astonished to find how easily my hand moved as I thrust the knife into his flesh…why was it that I had never stabbed a man before? I realised that I had been afraid, and that fear had been within me all the time, until the fleeting moment when I read fear in his eyes.(104)

The ripple effect created a mixture of fear and curiosity in her counterparts. In the dictum of Fanonical ideology of "revolutionary humanism", revolutionary violence needs no justification because it is an inevitable consequence of colonialism itself. Interestingly enough, this was not the moment when Saadawi chose to finish her novel and give her protagonist up to the authorities. After the murder, Firdaus became an unstoppable force devoid of fear. Later she tore up $3000 in the face of an Arab prince and slapped him in the face; the fear of this broken stereotype was reflected in his eyes and shocked the prince as well.

> I know why they were so afraid of me. I was the only woman who had torn the mask away, and exposed the face of their ugly reality. They condemned me to death not because I had killed a man- there are thousands of people being killed everyday- but because they are afraid to let me live. (110)

Firdaus became a symbol of the savage *absolute* truth- that she has no reason to fear the Other. The patriarchal masters are more reliant on her than she is on them. She became a dangerous beacon of the message and that is why she had to be condemned as soon as possible.

Conclusion

The paper has argued for a critical intersection of postcolonial and feminist schools of thoughts by using the works of Frantz Fanon and Nawal El Saadawi. The analysis reveals dehumanising tactics exercised by oppressive colonial and patriarchal forces. The philosophical perspectives of Fanon and Saadawihave been used to shed light on the impact of the Other on the creation of the subjectivity and treatment of the body. For Fanon, the struggle of the self with the Other is only done to avail complete freedom and autonomy over our being that is devoid of master-slave bondage. Fanon persuades his ideology of a *constructive* form of 'violence' to attest to the need for dissent in the face of extreme repression. The theory finds its parallel in Saadawi's character of Firdaus as she aggressively reclaims her agency and autonomy. The

violent practice of self and pursuit of dignity in the face of outrageous patriarchy suggests the need to transcend such rigid and hypocritical boundaries. The arguments of the paper have strived to critique oppressive ideological patterns and encourages us to analyse our fundamentals as human beings.

References

Brownmiller, Susan. *Against Our Will: Men, Women, and Rape*. Simon and Schuster, 1975.

Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge, 1999.

Coin, Francesca. "On the Condition of the Colonized Woman: the Nervous Conditions of Firdaus in Nawal El Saadawi's Woman at Point Zero (1983)." DEP. Deportate, esuli, refugee, no. 5-6, 2006, pp. 429-434. ISSN: 1824–4483.

Cooke, Rachel. "Interview Nawal El Saadawi: 'Do You Feel You Are Liberated? I Feel I Am Not'." *The Guardian*, 11 Oct. 2015, www.theguardian.com/books/2015/oct/11/nawal-el-saadawi-interview-do-you-feel-you-are-liberated-not. Accessed 10 Jan. 2024

Chancy, Myriam J. A. "Subjectivity in Motion: Caribbean Women's (Dis) Articulations of Being from Fanon/Capécia to the 'Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands.'" *Hypatia*, vol. 30, no. 2, 2015, pp. 434–49. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/24542165. Accessed 20 Mar. 2024.

Emma, Ming Wahl. *Black Women In Fanon's Black Skin, White Masks*. Stance 14, 2021, pp. 40-52.

Fanon, Frantz. *Black Skin, White Masks*. Pluto Press, 1986.

------- *A Dying Colonialism*. Grove Press, 1959.

-------*The Wretched of the Earth*. Grove Press, 1963.

hooks, bell. *Feminist Theory: From Margin to Center*. Pluto Press, 2000.

Hudis, Peter. *Frantz Fanon : Philosopher of the Barricades*. Pluto Press, 2015.

Kalisa, Chantal. "Black Women and Literature: Revisiting Frantz Fanon's Gender Politics." *The Literary Griot* 14.1&2 Spring/Fall, 2002, pp 1-22.

Lacan, Jacques. "The Subversion of the Subject and the Dialectic of Desire in the Freudian Unconscious." Écrits, translated by Bruce Fink, W. W. Norton & Company, 2006, pp. 671.

Nya, Nathalie. "Fanon and Mayotte Capecia." *Academia.edu*, https://www.academia.edu/8178664/Fanon_and_Mayotte_Capecia.

Sadaawi, Nawal El. *Woman at Point Zero*. Zed Books, 1990.

Sartre, Jean-Paul. *Being and Nothingness: An Essay in Phenomenological Ontology*. 1943. Routledge, 2018.

Sharpley-Whiting, Denean T. *Frantz Fanon. Conflicts and Feminisms*. Rowman& Littlefield, 1998

Vićentić, Jelena. "Reading Voices by Sulaiman Fayyad: At the Intersection of Feminist and Postcolonial Critique." Književnstvo, vol. 13, 2023, pp. 28-48.

Yokum, Nicole. A call for psycho-affective change: Fanon, feminism, and white negrophobic femininity. *Philosophy & Social Criticism*, *50* (2), 2024. https://doi.org/10.1177/01914537221103897

www.jnu.ac.bd